উৎসর্গ।

সাহিত্য যাঁহার সাধনার ধন ;

বঙ্গভাষা যাঁহার নিকট জননী সমা গরীয়সী ;

সাহিত্য-সেবী যাঁহার হৃদয়ের সখা ;

নীতি ও পবিত্রতা যাঁহার সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ ;

ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শে যাঁহার লেখনী পরিচালিত ;

ভাব ও চিন্তারাজ্যে যিনি বঙ্গের কার্লাইল ;

ভাষার সংস্কারে ও বিশুদ্ধ রচনাপ্রণালীর ব্যবহারে

যিনি নব্যলেখকগণের গুরুস্থানীয় ;

বঙ্গের সেই সুসন্তান,—ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষ,—

পরম পণ্ডিত, ভাওয়াল-রাজমন্ত্রী

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর

মহোদয়কে,

এই গ্রন্থ

প্রীতি ও শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ও ভালবাসার সহিত

অর্পণ করিলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। অথবা জলবিম্ব জলেই মিশিতেছে। সে অসীম, অপরিমেয়, অনন্ত বালুকারাশির হ্রাস-বৃদ্ধি কে নির্ণয় করিবে?

এই অসীম সৈকতভূমি, এই ভীষণ মরু,—এই প্রাণঘাতী স্থানে দুর্ভাগ্য দম্পতী সমুপস্থিত।

প্রাতঃকাল। সূর্য্যোদয় হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতের যে আনন্দ, উল্লাস, সজীবতা ও আশা,—তাহা এ রাজ্যে নাই। সঙ্গীতপ্রাণ পক্ষীর সেই প্রাতঃকালীন কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন, নিরীহ পশুকুলের খাদ্যান্বেষণে ভ্রমণ,—সে সব কিছু নাই। লোক-কোলাহল, লোক-সন্দর্শন, প্রিয়-সম্বোধন,—সে সব স্মৃতি,—এখানে আসিয়া মন হইতে এককালে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এখানে যাহা আছে, তাহা এখানেই সম্ভবে ও এখানেই শোভা পায়।

সূর্য্যোদয় হইয়াছে। স্থানমাহাত্ম্যে বাল-সূর্য্য দেখিতে দেখিতে, আপন প্রচণ্ড পরাক্রম-প্রকাশে মনোযোগী হইলেন। সূর্য্যের প্রখর

কিরণমালা অল্পে অল্পে সেই অনন্ত বালুকারাশি উত্তপ্ত করিতে লাগিল। সে উত্তাপে মরুভূমির প্রচণ্ডতা ও ভীষণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। রাত্রির বিষণ্ণতা ও নির্জ্জীবতার ক্ষোভ মিটাইবার জন্য, সেই অসীম বালুকারাশি এক্ষণে যেন সজীব ও সজাগ হইয়া সদর্পে আপন বিক্রম দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল,—এবং নিরীহ পথিককে বিপন্ন ও ভয়াকুল করিবার জন্য যেন আপনাদের সেই অতি সূক্ষ্ম সূচ্যগ্রতুল্য দাঁতগুলি বিস্তার করিয়া রহিল।

আকাশও অসীম, এই মরুও বুঝি অসীম। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল ঐ আকাশ দেখ, আর আকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অসীম বালুকাস্তূপ দেখ। যেন শ্বেতকায় বালির সমুদ্র;—কূল নাই, পার নাই, শেষ নাই, সীমা নাই। ইহা ছাড়া এখানে আর কিছু দেখিবার নাই। সূর্য্য-কিরণ যতই বালুকাস্তূপে পড়িতেছে, বালুকাস্তূপ ততই ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। বালুকার সেই সূক্ষ্ম সূচ্যগ্রতুল্য দাঁতগুলি ক্রমেই যেন অধিক-তর ধারালো হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণী-

বাতাসের সহিত এই দাঁতালো করাত-মুখ বালুকা-রাশির সংগ্রাম,—সে এক বিষম ব্যাপার। বালুকা-স্তূপে সূর্য্যরশ্মি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে,—অসীম বালুকাপ্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে,—আর সেই ভীষণ নির্জ্জনতার মাঝে বাতাসের সেই সোঁ-সোঁ রবের সহিত বালুকার যুদ্ধ। কিছু দূরে চাহিয়া দেখ, ঐ আকাশ ও প্রান্তর স্পষ্ট এক হইয়া গিয়াছে;—সেই একমাত্র বালুকা-প্রান্তরে—বালুকার রাজ্যে বায়ুর সহিত বালির সংগ্রাম!—গগনমণ্ডল ঘোর ধূলিময় হইতেছে,—চারিদিকে ধূলি উড়িতেছে,—দিক্‌নির্ণয়ের কোন উপায় নাই। তদুপরি কিরণমালীর সহস্রচক্ষু বিস্তার করিয়া কিরণ প্রকাশ,—অচ্ছেদ্য, অবিচ্ছিন্ন, জ্বালাময় কিরণ প্রকাশ।—অতি ভীষণ সৌন্দর্য্য! কল্পনার চক্ষুও বুঝি ঝলসিয়া যায়!

এ হেন বিষম স্থানে, এই ভয়াবহ নির্জ্জনতায়, দুর্ভাগ্য দম্পতী সমুপস্থিত।

প্রাতঃকাল অতীত হইয়াছে। দুষ্টগ্রহ-পরিচালিত, নিয়তি-তাড়িত, দারিদ্র্য-সহচর, বুবুক্ষু

দম্পতী আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। পা আর চলে না,—হায়! তবুও চলিতে হইবে। সঙ্গে একটি শীর্ণকায় ক্ষুদ্র অশ্ব; অশ্বের পৃষ্ঠোপরি একটি থলিতে কতক দ্রব্য। একটি অর্দ্ধমৃত শীর্ণ বৃক্ষের মূলদেশে একগাছি রজ্জু দ্বারা অশ্বটি আবদ্ধ। মরু-বৃক্ষের অবস্থাই এই।—তাহা এই-রূপ অর্দ্ধমৃত অবস্থাতেই চিরজীবিত। তাহাতে আরণ্য বা গ্রাম্যবৃক্ষের সে সজীবতা বা প্রফুল্লতা নাই, সে নীলিমা নাই, পত্র-পুষ্প-কাণ্ডের সে শোভা নাই, বিরামদায়িনী ছায়া কিংবা সে সরসতা নাই,—সাধারণতঃ বৃক্ষের সে বৃক্ষত্বের কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দুঃখী দম্পতী এই বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়াছেন। এখন দিবাকাল,—আবার পথ চলিতে হইবে।

কতদিন এমন চলিয়াছেন,—পথ ত ফুরায় না! অনাহার, পথশ্রম, উদ্বেগ, আশঙ্কা,—দারুণ অবসাদে দুর্ভাগ্য দম্পতীর দেহ ও মন দুই-ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।—কতদিনে এ পথ ফুরাইবে?

কতদিনে তাঁহারা এ ভীষণ প্রান্তর উত্তীর্ণ হই-বেন ? বন্ধু নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই,—একজন সহযাত্রী পথিকেরও দেখা নাই,—তাঁহাদিগকে এই ভীষণ প্রান্তর একরূপ নিঃসম্বলে পার হইতে হইবে।

পুরুষটি যুবাবয়স্ক। আকৃতি দেখিলে তেজস্বী ও শ্রমশীল বলিয়া বোধ হয়। দীর্ঘ ললাট, আজানুলম্বিত বাহু, উজ্জ্বল চক্ষু,—মুখাবয়বে মহত্ত্ব বিকশিত। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সে মহত্ত্ব প্রতিভাত। অন্তর মহৎ বলিয়া পুরুষটিকে বড়ই সুশ্রী দেখাইত। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলিকে খুটী-নাটী করিয়া ধরিয়া দেখিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তেমন রূপবান্ ছিলেন না।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী কিন্তু সত্য সত্যই পরম-রূপবতী। কাঁচা সোণার যে রং, সেই রঙ্গে তাঁহার চারু-দেহ চিত্রিত। মুখখানি মাধুর্য্যে মাখা। সরলতা ও পবিত্রতার মধ্যে যে স্বর্গীয় লাবণ্যটুকু আছে, সেই লাবণ্য তাঁহার মুখে প্রক-টিত। চক্ষু দুটি হাসি-অশ্রু মাখা,—সদাই চল-

চল, সদাই পরদুঃখকাতর। আর বেশী কিছু বলিব না।—রূপ-বর্ণনার স্থান এ নয়।

সুন্দরী অতিমাত্র ক্ষীণকলেবরা,—আসন্ন-প্রসবা।

হায়! একে এই দুর্গম, বিপদ-সঙ্কুলময় ভীষণ মরুভূমি, তদুপরি তিনি আসন্ন-প্রসবা।—স্বামীর দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার আর সীমা নাই। এই সসত্ত্বা সহধর্ম্মিণীকে লইয়া কি তিনি নির্ব্বিঘ্নে এই দুস্তর মরু পার হইতে পারিবেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মরুভূমি পারের উপযোগী একটি চর্ম্ম-থলিতে কিঞ্চিৎ পানীয় জল এবং আর একটি পাত্রে কিছু আহারীয় দ্রব্য সংগৃহীত ছিল। কয়েক দিনের পর্য্যটনে তাহাও শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন উপায় কি? আশ্রয়হীন মরুভূমে থাকিবারও স্থান নাই, ফিরিবারও পন্থা নাই, পার হইবারও কোন সম্বল নাই।—তবে উপায় কি?

সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে—সর্ব্বত্রই অনন্ত বালুকারাশি ধূ-ধূ করিতেছে। কতদূরে পথ,—কোথায় লোকালয়, কে জানে? একটি মনুষ্য-মূর্ত্তিরও দর্শন নাই,—কে বলিয়া দিবে, এ কান্তারের শেষ কোথায়?

বৃথা ভাবনায় বসিয়া থাকায় সময় নষ্ট ও

জীবনাশঙ্কা,—গমনেও তাই,—তবে সময় নষ্ট নয়;—অগত্যা মন্দভাগ্য স্বামী সহধর্ম্মিণীর হাত ধরিয়া, কষ্টে সহধর্ম্মিণীকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দিলেন। অশ্ব মৃদুগতি। নিজে সেই অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে ছত্রহস্তে পদব্রজে চলিলেন।

স্বামী ছত্রহস্তে পদব্রজে যাইতেছেন, পত্নী অশ্ব-পৃষ্ঠে,—এ দৃশ্য কাহারও কাহারও মনে কেমন-কেমন লাগিতে পারে। কিন্তু এখানে মনের সেই ভাবটি ভুলিয়া, এই দেশ কাল পাত্রকে বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, এই ঘোর বিভীষিকাময় দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম করা,—একজন ক্ষীণ-প্রাণা, অন্তঃপুরচারিণী, সসত্ত্বা আসন্নপ্রসবা রমণীর পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

বেলা যত বাড়িতে লাগিল, মরুভূমির অবস্থা ততই ভীষণ ভয়াবহ হইতে লাগিল। প্রখর আতপতাপে, ততোধিক বালুকার উত্তাপে, তিনটি প্রাণী একযোগে দগ্ধ হইতে লাগিল। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল। চর্ম্ম-থলিতে যে অবশিষ্ট জলটুকু ছিল, স্বামী স্ত্রীতে তাহা পান

করিলেন। অশ্বকে মরুভূমি-জাত ‘পান্থপাদপ’ বৃক্ষের রস খানিকটা খাইতে দিলেন। দুর্ভাগ্য-দম্পতী আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামীর মনে অকূল ভাবনা আসিল,—“হায়! কিরূপে প্রিয়তমার জীবন রক্ষা করি? যাহার জন্য লোকালয় ছাড়িয়া, জননী-জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া এ দুর্গমে আসিলাম,—এখন কিরূপে কোন্ উপায়ে তাহাকে রক্ষা করি?”

মনে ভয়, দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য,—যুগপৎ বিরাজ করিতে লাগিল।

দম্পতীর সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত;—মলিন বেশ আরও মলিন হইয়া গিয়াছে; দারুণ পথশ্রমে ও মনের উৎকণ্ঠায় দেহের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের বর্ত্তমান,—ঘোর বিভীষিকাময়; ভবিষ্যৎ,—গাঢ় অন্ধকারে আবৃত। দম্পতীর—বিশেষ স্বামীর মনের অবস্থা তখন কিরূপ, তাহা স্বামীই বুঝিতেছেন।

স্ত্রীকে উপস্থিত বিপদের কথা তিনি সকল খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না। যে যৎকিঞ্চিৎ

আহার্য্য দ্রব্য ছিল, পথিমধ্যে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গেল। স্বামী তখন মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

আবার মনে আশার সঞ্চার হইল;—"ভয় কি? যিনি রাজাসনে রাজার আহার যোগাইতে-ছেন, তিনি এই নির্জ্জন মরুভূমে ক্ষুদ্র কীটাণুরও আহার দিয়া থাকেন।"

সুখ-কল্পনা মনে উঠিতে-না-উঠিতে বিলয়,—অমনি আবার প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যন্ত্রণায় কাত-রতা।—আবার পিপাসায় কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইল; আবার ক্ষুধার তাড়নায় দেহ অবশ হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে এবার নিকটে পান্থপাদপও দৃষ্টি-গোচর হইল না।—"জগদীশ্বর! এ কি করিলে?"

মর্ম্মচ্ছেদকর একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত স্বামীর মুখ দিয়া এই কথাটি নির্গত হইল।

স্ত্রী অমনি অশ্ব থামাইয়া, ভয়বিহ্বলকাতরা হইয়া স্বামীর মুখপানে চাহিলেন। স্বামীর চমক ভাঙ্গিল; সপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "না, পূর্ব্ব-স্মৃতি মনে জাগিতেছে।"

"যাহা মনে করিলে কষ্ট হয়, সেরূপ চিন্তা মনে স্থান না দেওয়াই ভাল।"

স্ত্রী, মুখে এইরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহার অন্তরেও অতীতের সকল স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তখন স্বামী স্ত্রীতে আপনাদের পরিণয়-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া পরস্পরের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পাঠক পাঠি-কার কৌতূহল নিবারণার্থ, আমরা সংক্ষেপে এই-খানে এই দুর্ভাগ্য দম্পতীর পরিচয় দিই।

পারস্যদেশের অন্তর্গত তিহিরাণ নগর,—এই দম্পতীর জন্মভূমি। জাতিতে ইহাঁরা মুসলমান। স্বামীর নাম ঘিয়াস বেগ; স্ত্রীর নাম—আমিনা। ঘিয়াস একজন প্রকৃত প্রেমিক। তিনি জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বান্। তাঁহার পিতা একজন কবি ছিলেন; পিতৃগুণ পুত্রও পাইয়াছেন;—ঘিয়াসও একজন মার্জ্জিতহৃদয় তীক্ষ্ণ অনুভবক্ষম কবি। জীবনসঙ্গিনীকে আপন মনোমত করিবার জন্য, ঘিয়াস পত্নীকেও আপন হৃদয়ের ভাব ও চিন্তা প্রদান করিয়াছেন। তাহার ফলে, আমিনাও প্রখর অন্তর্দৃষ্টিশালিনী, বুদ্ধিমতী ও বিদুষী হইয়াছেন।

আমিনার অতুল্যরূপে ও বহুগুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া, ঘিয়াস আত্মীয় স্বজনের অমতে আমিনাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আত্মীয় স্বজনের অমতের কারণ এই,—বংশমর্য্যাদায় ও আভিজাত্যে, আমিনা,—ঘিয়াস হইতে নিকৃষ্ট। কিন্তু প্রেমের আকর্ষণ হইতে ঘিয়াস আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। সমগ্র জগৎ একদিকে, আমিনা আর এক দিকে; জগৎ তুচ্ছ—আমিনা গরীয়সী;—আমিনাকে পরিত্যাগ করিয়া ঘিয়াস জগৎ-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে চাহেন না।

প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের এই ভাব লোকে নানাভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা বুঝে যে,প্রেমেই হৃদয়ের সজীবতা এবং জীবনের স্ফূর্ত্তি, তাহারা জানে, প্রেমিক প্রেমের সেবার জন্য জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে! সত্যই ঘিয়াস অতি পবিত্রহৃদয়ে সেই মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য কাহারও বাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া এবং কোনরূপ বিঘ্নবাধা না মানিয়া, তিনি আমিনাকে বিবাহ করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইহার ফলে আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে ত্যাগ করিল; শেষে

তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে লাগিল। ঘিয়াসের যে কয়দিন কিছু অর্থবল ছিল, সেই কয়দিন ঘিয়াস সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুঝিতে লাগিলেন। শেষে অর্থ ফুরাইয়া আসিল, অত্যাচারও চূড়ান্ত রকম চলিতে লাগিল;—তখন অনন্যোপায়ে দেশ ত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হইলেন। মনে ভাবিলেন, "আর কেন? এইবার দেশ ত্যাগ করিয়া, বিদেশে—ভিন্ন-রাজ্যে গিয়া আপন অদৃষ্ট একবার পরীক্ষা করিয়া [illegible]খি।"

মোগলসম্রাট আকবর তখন ভারতের অধীশ্বর। ঘিয়াস, সম্রাটের রাজধানীতে যাইতে মনস্থ করিলেন। লাহোরে তখন আকবরের বিচার-সভা ছিল। আগ্রা এবং দিল্লীতেও পর্য্যায়-ক্রমে এই বিচার-সভা হইত। লাহোর, আগ্রা ও দিল্লী—এই তিন স্থান তখন ভারতের রাজধানী বলিয়া গণ্য হইত। নিরুপায় ঘিয়াস, পত্নীসমভি-ব্যাহারে এই লাহোরে উপনীত হইবার মানসে জন্মের মত জন্মস্থান ত্যাগ করিলেন।

যে অত্যাচারে মানুষকে জন্মের মত জন্মভূমি

বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা সাধারণ অত্যাচার নহে। লোকে ঘৃণা ও ঈর্ষাবশে, নানা মিথ্যা অভিযোগে ঘিয়াসকে প্রপীড়িত করিল; নানা নীচ উপায় উদ্ভাবন করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার অখ্যাতি রটাইল; তাঁহাকে প্রাণে মারিবার জন্যও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল! নির্ভীক ঘিয়াস প্রিয়তমা—কেবলমাত্র প্রেমময়ী প্রিয়তমার মুখ চাহিয়া সে সকলই নীরবে সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু মানব-সহিষ্ণুতার সীমা আছে। আত্মীয় স্বজন সে অটল পর্ব্বত স্থানচ্যুত করিতে না পারিয়া, পর্ব্বতাশ্রিতা সেই প্রফুল্লময়ী ক্ষীণ লতিকাকে আশ্রয়চ্যুত করিতে যত্নপর হইল। যে একটুকু উষ্ণ নিশ্বাসে মুহূর্ত্তে শুকাইয়া যায়, সে হৃদয়হীন দয়ামায়াশূন্য আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্ব্যবহারে ম্লান ও মলিন হইবে বৈকি? ঘিয়াস তখন অনন্যোপায়ে দেশত্যাগী হইলেন। কিন্তু হায়! যে কোমল কুসুম নিষ্ঠুর কীটের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন, তাহা যে কান্দাহারের প্রচণ্ড মরুতে শুকাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ঘিয়াসের সে চিন্তার অবসর ছিল না। অথবা তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে কমলিনী

শিশির স্পর্শে ম্লান হয়, তাহাই আবার অকাতরে প্রখর রবিকর হৃদয়ে ধারণ করে!

পথে কান্দাহারের এই বিস্তীর্ণ বিশাল মরু-ভূমি। নিঃস্ব ঘিয়াস নিঃস্ব অবস্থাতেই এই মরু পার হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অদম্য সাহসী ও বিপুল মনোবলে বলীয়ান্ তিনি;—তাই সমস্থা অন্তঃপুরবাসিনী বনিতাকে লইয়া এই ভীষণ মরু-ভূমি পারের সঙ্কল্প করিয়াছেন।—সঙ্কল্পে কি তিনি সিদ্ধ মনোরথ হইবেন না?

পথে চলিতে চলিতে সেই কথাই হইতে লাগিল। সে সকল দুঃখের কথা সন্দেহ নাই; বর্ত্তমান দুঃখে অতীত সুখের স্মৃতি অতীব মর্ম্ম-পীড়ক,—তাহারও সন্দেহ নাই;—কিন্তু তবুও তাহাতে একটু সুখের আস্বাদ, একটু মধুরতা, একটু অনির্ব্বচনীয় প্রফুল্লতা আছে;—সেই জন্য দুঃখের সময়েও লোকে অতীত সুখের চিত্র ভুলিতে পারে না। যে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণের দিকে চাহিয়া বলিতে পারে না—"হা! কি ছিলাম,"—তার বাড়া দুঃখী বুঝি আর কেহ নাই! অতীতের স্মৃতি বর্ত্তমান দুঃখকে গাঢ়তর করে বটে, কিন্তু

সেই দুঃখের মধ্যেও একটু নির্ম্মল আনন্দ আছে। দুর্ভাগ্যদম্পতী সেই অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়া সেই নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

আমিনা কহিলেন, "প্রিয়তম, আমাকে বিবাহ করিয়াই তোমার এই কষ্ট;—কেন আমাকে গ্রহণ করিয়া চিরজীবন অসুখী হইলে?"

প্রেম-পরিপ্লুতস্বরে ঘিয়াস্ উত্তর দিলেন, "প্রিয়তমে, তোমাকে গ্রহণ করিয়া আমি অসুখী হইয়াছি? এ চিন্তা তুমি মনেও স্থান দিও না!"

"আর কিছু না হোক্, আমাকে বিবাহ না করিলে আজ তোমাকে দেশত্যাগী হইতে হইত না, আর এমন দশায়ও পড়িতে হইত না।"

"না প্রিয়ে, ওটা তোমার ভুল ধারণা। যা হইবার, তা হইবে। তুমি ত অদৃষ্ট মান? ঈশ্বর যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, কিছুতেই তাহা অন্যথা হইবার নহে।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন,

"আর এটা কি তুমি ভাব, আমি এই দুঃখকে দুঃখ মনে করি? তোমাকে পাইয়াছি বলিয়া আমার যে সুখ,—আমার দেশত্যাগী বা নিঃ

হইবার তুলনায় তাহা অনেক বড়। আর কে বলিল, আমার এই দুরবস্থাই আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল নয়? দুঃখ না পাইলে, মানুষ প্রকৃত বড় হয় না।—প্রিয়ে, মনে কেবল মাত্র এই ক্ষোভ রহিয়া গেল,—আমি মানুষকে বুঝাইতে পারিলাম না, তোমাকে পাইয়া আমি কত সুখী!"

"এমনই ভাগ্যবতী আমি!—জন্ম জন্ম তোমার পদসেবাই যেন অদৃষ্টে থাকে।"

সেই করুণাপূর্ণ ঢল ঢল চোক দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সেই যবনী সাধ্বী অশ্বকে থামাইলেন; স্বামীর মহত্ত্ব-বিকশিত মুখমণ্ডলের প্রতি একবার চাহিলেন। স্বামীর হস্ত হইতে ছত্রটি লইয়া বন্ধ করিলেন। সেই অশ্বপৃষ্ঠোপরি থাকিয়াই, আবেগভরে হৃদয়ের পূর্ণ অনুরাগের সহিত,—স্বামীর গলদেশ আকর্ষণ করিলেন। অতঃপর মুহূর্ত্তকালের জন্য স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া রহিলেন।—কে বলিতে পারে, সেই মুহূর্ত্তে, কয় ফোঁটা অমৃত সংস্পর্শে, স্বামীর আজীবনসঞ্চিত বুকের উত্তাপ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইল না?

মুহূর্ত্তের সুখ, মুহূর্ত্তের আনন্দ, মুহূর্ত্তের আত্ম-বিস্মৃতি ;—এ কি মরুভূমি না নন্দনকানন ?—হায় প্রেম! তুমি কি সুন্দর! কিসে তুমি, কেমন তুমি, কোথায় তুমি,—তোমায় কেহ চিনিল না! হায়, তুমি প্রেম!

কিন্তু হায়, মুহূর্ত্তের সুখ-স্বপ্ন মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইল। মুহূর্ত্ত পরেই উভয়ের চৈতন্যোদয় হইল; দেখিলেন,—বিশাল মরুভূমি বিশাল বালুকারাশি বুকে লইয়া, অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া ধূ-ধূ-ধূ জ্বলিতেছে।

অমনি বুক শুকাইল, হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিয়া উঠিল,—ভীতি ও বিভীষিকা যেন উলঙ্গমূর্ত্তিতে সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সভয়ে উভয়ে দেখিলেন, পদতলে সেই অনন্ত বালুকা-রাশি ; মাথার উপর সেই সহস্রাক্ষী প্রদীপ্ত সূর্য্য ; আর কেহ কোথাও নাই।—নীরবে উভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন।

আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর বড় কষ্ট হইতেছিল। পাছে স্বামী কাতর হন, এজন্য মুখ ফুটিয়া তিনি তাহা বলিতে পারিলেন না। বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু সহৃদয় স্বামী তাহা সহজেই বুঝিতে

পারিলেন। বুঝিতে পারিয়াও কিন্তু তিনি স্থিরা হইয়া রহিলেন;—কারণ তখন তাঁহার মনে আর এক উৎকট দুশ্চিন্তা জাগিতেছে;—"দিবাভাগ ত একরূপ কাটিয়া যাইবে; কিন্তু রাত্রের উপায় কি? সম্মুখেই যে কাল রজনী! এক বিন্দু জল কিংবা এক টুক্‌রা পৃষ্টক বা রুটীও যে নাই;—এই উৎকট পথশ্রমের পর নিরাহারে কিরূপে রজনী কাটিবে? ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট সসত্ত্বা বনিতাকে কি দিয়া প্রাণ বাঁচাইব? হায়, এ বিজন মরুভূমে কেবলমাত্র তৃষ্ণার জলই বা কোথায় মিলিবে? বুঝি, আজিকার কালনিশি আমার আর প্রভাত হইবে না! বুঝি, আজ রাত্রে প্রিয়তমাকে হারাইব!"

ঘিয়াসের হৃদয়-সমুদ্র মথিত হইতে লাগিল। সহিষ্ণুতার অবতার তিনি;—নিজের জন্য বিশেষ চিন্তা নাই।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। মরু-ভূমির ভীম প্রচণ্ডতা কমিতে লাগিল। সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হইয়া বিশাল বালির সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাল নিশীথিনী। বিশাল মরু-প্রান্তরে ঘন অন্ধকার। আশ্রয়হীন শূন্য মরুভূমে ভীষণ নীরবতা। বনের পশুও এ নীরবতায় ভয় পায়। মূর্ত্তিমান্ ভীতি, নৈরাশ্য ও মৃত্যু যেন করাল মুখব্যাদান করিয়া দণ্ডায়মান। প্রকৃতির এ গম্ভীর নির্জ্জনে, এ উন্মুক্ত ভীষণ প্রান্তরে, নিরাশপ্রাণ দম্পতী নিঃসম্বলে সমুপস্থিত।

ঘিয়াসের এখন চিন্তারও সময় নাই,—কি উপায়ে বনিতাকে রক্ষা করেন।

অসীম বালুকাস্তূপের এক স্থানে একখানি গালিয়া বিছাইলেন। ছত্রটি খুলিয়া তাহার সহিত আর খানিকটা বস্ত্রসংযুক্ত করিয়া, ঘিয়াস এক প্রকার তাম্বু প্রস্তুত করিলেন। নিশাকালের

শীতলতা হইতে সসত্ত্বা বনিতার স্বাস্থ্য বনিতা করা চাই। আমিনা সেই তাম্বুর মধ্যে অস্ফুট হইলেন।

অতঃপর ঘিয়াস অদূরস্থ এক মরু-বৃক্ষে সেই শীর্ণকায় দুর্ব্বল অশ্বটিকে বন্ধন করিলেন। থলিতে অতি অল্পমাত্র ঘাস ছিল, অশ্বকে তাহা খাইতে দিলেন। মনে মনে কহিলেন, "খোদার জীব! তোমার যাহা শেষসম্বল ছিল, দিলাম; কল্যকার চিন্তা কল্য করিব;—আমাদের আজিকার সংস্থানও কিছু নাই।"

ঘিয়াস্ আজ বড়ই উন্মনা। দারুণ অবসাদে ও দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত। পিপাসায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে। অনাহার ও পথশ্রমে শরীর অবশ। উপর্য্যুপরি কয়দিন বনিতার অগোচরে, নিজে নাম মাত্র খাইয়া, বনিতাকে খাওয়াইয়াছেন—কিন্তু হায়! আজ যে কিছুই নাই। এক কণিকা পৃষ্টক বা রুটী,—পাত্র বারংবার ঝাড়িয়া দেখিলেন,—কিছুই ত নাই! চর্ম্ম থলিটি উপুড় করিয়া দেখিলেন,—হায়! এক বিন্দু জলও ত পাইলেন না? তবে, আজ কি হইবে?

——আজ তিনি প্রিয়তমা আমিনার জীবন করিবেন ?

আর কথন ত মরুভূমি পার হন নাই ;—সুতরাং যত কষ্ট মনে করিয়া দেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, এখন বুঝিলেন, কষ্ট তার শত গুণ। পার হইবার যে সময় লাগিবে অনুমান করিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন, তাহার বিশগুণ অধিক সময়ে পার হইতে পারিলেও ভাগ্যের কথা !

ভাবিতে ভাবিতে ঘিয়াস চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। আকাশে চাহিয়া দেখিলেন, অন্ধকার ; সম্মুখে পশ্চাতে দেখিলেন, অন্ধকার ; নিজ হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন, বড়ই অন্ধকার। গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘিয়াস তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণপ্রতিম আমিনা মৃতবৎ নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছেন।

বড় বিপদে এক সাহস হয়। উন্মনা ঘিয়াস মনে কি ঠাওরিয়া, তখনই অগ্নি প্রজ্বালি[illegible] করিলেন। মরু-বৃক্ষের কতকগুলা শুষ্কপত্র সংগৃহীত করিয়া, চকমকি ঠুকিয়া তাহাতে আগুন করি-

লেন। এবার দেখিলেন, তাঁহার অর্দ্ধমৃতা বনিতা নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া যাতনাজড়িত স্বরে অস্ফুট চীৎকার করিতেছেন। বুঝিলেন, ক্ষুৎপিপাসায় আমিনার প্রাণ কণ্ঠাগত। গাত্র স্পর্শ করিয়া বুঝিলেন,—আর কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিলে নিশ্চয়ই আমিনার প্রাণ বহির্গত হইবে।

উন্মত্তবৎ লাফাইয়া উঠিয়া, ঘিয়াস থলির মধ্য হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছোরা ও একটি পানপাত্র গ্রহণ করিলেন এবং ক্ষিপ্রগতিতে তাম্বু হইতে বহির্গত হইয়া উন্মত্তবেগে আপন অশ্বের সম্মুখীন হইলেন; এবং এতটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া সেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সবেগে অশ্বের গলদেশে বসাইয়া দিলেন।

লিখিতে যত সময় গেল, ইহার সহস্রাংশেরও কম সময়ের মধ্যে এই কার্য্য সাধিত হইল।

ঝর ঝর ধারে রক্তধারা পড়িল।—অশ্বের দেহ ও মুণ্ড পৃথক হইয়া ভূপতিত হইল। চক্ষের নিমেষে সেই অসীম বালুকাস্তূপ,—সদ্য-সংহৃত অশ্বের সদ্যোরক্ত অনেকটা শোষিয়া লইল। উন্মত্ত ঘিয়াস তখন সেই ভূপতিত পশুর কিঞ্চিৎ

সন্তোরক্ত পানপাত্রে লইয়া, ত্বরিতপদে তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গিয়া দেখিলেন,—বিধির বিধান,—তাঁহার মুমূর্ষু সহধর্ম্মিণী এক কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছেন! কন্যার রূপে সেই অন্ধকার মরুও যেন আলোকিত হইয়াছে। সদ্যঃ-প্রসূত শিশুর ক্রন্দন মিয়াসের অন্তরে বাৎসল্য-স্নেহ উথলিয়া দিল। কিন্তু তখন সে স্নেহভোগের সময় নয়,—তিনি অবিলম্বে সেই সংহৃত পশুর সন্তোরক্ত স্ত্রীর মুখে ধরিলেন। বিস্বাদ ও কটু হইলেও, পিপাসাকাতর নবপ্রসূতা আমিনা সেই রক্ত একটু পান করিলেন। তাঁহার প্রাণ-ঘাতিনী পিপাসার একটু উপশম হইল; তিনি অপেক্ষাকৃত একটু সুস্থ হইলেন।

এতক্ষণে মিয়াস যেন প্রকৃতিস্থ হইলেন। এইবার তিনি যেন প্রাণ খুলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

হাঁ, প্রাণ খুলিয়াই বৈ কি? বড় দুঃখের দশায়, বড় বিপদ সময় আপনার জনের কাছে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেও ভয় হয়। পাছে সেই নিশ্বাসটিও,—অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গল প্রকাশ করিয়া

স্নেহ। ঘিয়াসের সে নিশ্বাসে যে উষ্ণতা, যে আকুলতা, যে অনুরাগ, যে আবেগ, যে স্নেহ, যে প্রেম, যে ভালবাসা ছিল, তাহা সেই ব্যথার ব্যথী আমিনা বুঝিলেন। সাধ্বী নীরবে, বাষ্পাকুল লোচনে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিলেন। নবপ্রসূতা শিশুকন্যা জননীর বক্ষোপরি স্থাপিত রহিল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ঘিয়াস বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার প্রাণরক্ষার জন্যই এই নৃশংসের কাজ করিয়াছি। দেখ, ইহার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যে জীবটিকে হাতে করিয়া আহার দিয়াছি, তোমার প্রাণরক্ষা গুরুতর হওয়ায়, তাহাকেই আবার স্বহস্তে এইক্ষণ বধ করিলাম। প্রিয়ে, তাই ভাবিতেছি, মানুষ কি? আর প্রভাত হইলে তোমাকেই বা কি উপায়ে এই মরুভূমি দিয়া হাঁটাইয়া লইয়া যাইব?"

আমিনা অশ্বহত্যার বৃত্তান্ত শুনিয়া অবশ্যই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু নিজের হাঁটিয়া যাইবার কথা শুনিয়া কহিলেন, "নাথ, যিনি রাত্রির পরে প্রভাত করিবেন, তিনি আমাদের কন্যাকার ভাবনাও ভাবিবেন। যদি নিরাশ্রয়ে এই ভীষণ মরুভূমে

সন্তান প্রসব করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তবে আর হাঁটিয়া মরুভূমি পার হইতে পারিব না? প্রিয়তম, ও সব চিন্তা এখন ভুলিয়া যাও;—এখন এই অভাগ্য শিশুটি যাতে রক্ষা পায়, তার উপায় কর; আর নিজেও কিছু খাও,—প্রাণ বাঁচাও।"

ঘিয়াস সেই সংহৃত অশ্বের সদ্যোরক্ত নিজেও কিছু পান করিলেন। তার পর আর একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া সেই অশ্বমাংস কিয়দংশ অগ্নিদগ্ধ করিলেন এবং ক্ষুধার তাড়নায় স্বামীস্ত্রীতে তাহাই কিছু কিছু ভক্ষণ করিলেন। নবজাত শিশু জননীর স্তনপান করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘিয়াস সারারাত্রি জাগিয়া বিশেষ সাবধানে ও অতি সন্তর্পণে, প্রসূতি ও প্রসূতের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রিও পোহাইল। নব-সূর্য্য উদিত হইল। সদ্যোজাত শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া আমিনা,—এবং একটি ভারপূর্ণ মোট মাথায় করিয়া ঘিয়াস,—সেই দুর্গম মরু পার হইতে লাগিলেন।

নবপ্রসূতির পক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একপদ অগ্রসর হওয়াই কঠিন; তদুপরি প্রসূত শিশুকে বক্ষে লইয়া আমিনার দুর্গম মরুভূমি পারের চেষ্টা;—এ চেষ্টা কি সফল হয়?

মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণু-প্রতিমা আমিনা তবুও চলিতে লাগিলেন। কিন্তু সে পাদক্ষেপে, প্রতি-নিঃশ্বাসে তাঁহার আয়ু ক্ষয় হইতে লাগিল। প্রতি-ক্ষণে তিনি মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগি-

লেন। প্রতি বালু-কণা তাঁহার পায়ে শেলসম বাজিতে লাগিল। সে ভারবাহী অশ্ব আর নাই,—কাজেই মরুভূমি পারের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভারে ভারপূর্ণ মোটটি ঘিয়াস মস্তকে লইয়াছেন;—এমত অবস্থায় তিনিও পত্নীকে কোন সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। দারুণ কষ্টে দুর্ভাগ্য দম্পতী নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন।

নিষ্ঠুর মরুভূমি, এই পরিদৃশ্যমান্ জড়প্রকৃতি,—বহু দুঃখ প্রদানের পর বুঝি দুর্ভাগ্য দম্পতীর প্রতি সদয় হইল। তাঁহারা অতি কষ্টে কিছুদূর গিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, বিধাতার প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ এক মনোহর হ্রদ সম্মুখে,—অনুমান অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে বিরাজ করিতেছে! হ্রদের সে হাস্যমুখী মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া,—পথশ্রমক্লিষ্ট, অর্দ্ধমৃত দম্পতীর মনে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা দেখিলেন, স্বচ্ছ সলিলরাশি বুকে লইয়া নয়নাভিরাম স্বভাবসুন্দর মনোহর হ্রদ সোহাগে ঢল ঢল করিতেছে। তদুপরি

নব-সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হ্রদ-তীরস্থ স্নিগ্ধ ছায়াপূর্ণ শ্যামল বৃক্ষরাজী ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। গো মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু সকল তথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছে, এবং নির্ভয়ে মনের সাধে নব তৃণাঙ্কুর ভক্ষণ করিতে করিতে, মধ্যে মধ্যে হর্ষসূচক ধ্বনি করিতেছে। সর্ব্বত্রই প্রীতি ও অনন্দ এবং শান্তি ও সখ্যভাব। নয়নরঞ্জক মনোহর লতাগুলি ঈষৎ বায়ুভরে দুলিতে দুলিতে যেন শ্রমাতুর পথিককে প্রীতিভরে আহ্বান করিতেছে! যেন বলিতেছে,—"এস এস,—শ্রান্ত, ক্লান্ত, তৃষাতুর পথিক! এস এস, এ স্বর্গরাজ্যে এস! বড় কষ্ট তুমি পাইয়াছ,—এস, এখানে আসিয়া বিশ্রাম কর! দেখ, এখানে কত জল, কত ছায়া, কত বৃক্ষ! এস, এ সুশীতল জলে অবগাহন কর,—প্রাণ পূরিয়া এ জল পান কর;—এস, এ স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায় আসিয়া প্রাণ জুড়াও! বড় কষ্ট তুমি পাইয়াছ,—এখন আসিয়া সুখভোগ কর। বড় দুঃখের পর সুখ,—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।"

ঘিয়াস ও আমিনা, এই অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন ও এই মধুরভাবে হৃদয় পূর্ণ করিলেন।

পাঠক, এখন একবার তোমাকে কল্পনাবলে এই মরুভূমি দর্শন করিতে হইবে এবং মরুভূমি পারের এইসব কষ্টও তোমায় অনুভব করিতে হইবে; তার পর প্রকৃতির এই স্বর্গীয় ছবি—এই মনোহর হ্রদও অবলোকন করিতে হইবে;—নহিলে এই দুর্ভাগ্য দম্পতীর তদানীন্তন প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিবে না।

ঘিয়াস ও আমিনা মনে করিলেন, সত্যই আর কিছু পরেই, তাঁহারা মর্ত্তে নন্দনকাননের সুখ উপভোগ করিবেন। এত দুঃখের পর যে এত সুখ ভাগ্যে ঘটে, ইহা স্মরণ করিয়া, দুঃখী দম্পতী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে অশ্রু কেমন, তাঁহারই বুঝিলেন।

"জগদীশ্বর, এত দয়া তোমার!"—হর্ষ-উৎসাহ-আবেগ ভরে, ঘিয়াস এই কথা বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"জগদীশ্বর, এত দয়া তোমার! এমনি করিয়া কি তুমি জীবকে শিক্ষা দাও?—প্রিয়ে,

কোন রকমে আর এই পথ টুকু বুক বাঁধিয়া চল। ঐ দেখ, বিধাতার মঙ্গলময় হস্ত লতার মোহন-রূপ ধারণ করিয়া স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ আমা-দিগকে আহ্বান করিতেছে।”

আমিনা। নাথ! সকলই তাঁর কৃপা। নহিলে এ আশ্রয়হীন ভীষণ মরুভূমে কে এই শিশুকে বাঁচাইল?—চল প্রিয়তম, ঐ স্নিগ্ধ তরুতলের শ্যাম ছায়ায় বসিয়া, সেই বিশ্বনিয়ন্তার মহিমা ধ্যান করি।

হর্ষোৎফুল্লঅন্তরে, উৎসাহভরে নব আশা-প্রাপ্ত দম্পতী পথ চলিতে লাগিলেন! কিয়দ্দূর গিয়া ঘিয়াস বলিলেন, “প্রিয়তমে! আবার কি মনোহর দৃশ্য দেখ। ঐ আনন্দময় হ্রদের তীর-ভূমে, ঐ দেখ, কি সুন্দর আনন্দময় নগর! দেখ দেখ, ঐ বিরাট নগর-দ্বার অতিক্রম করিয়া, শত শত লোক মুখে উৎসাহ ও আশা এবং চক্ষে আনন্দ ও প্রীতি লইয়া আপন আপন বিষয়-কার্য্যে মনোযোগী হইতেছে। সকলেরই হৃদয় যেন প্রেম-ভারে পূর্ণ; সকলেই যেন এ নিরাশ্রয় দুর্ভাগ্য বিদেশীদিগকে আতিথ্য-সৎকারে পরি-

তৃপ্ত করিবে,—এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছে। প্রিয়ে, চল, আরও একটু ত্বরিতগতিতে ঐ বাঞ্ছিত স্থানে যাই।"

"চল নাথ, চল, হৃদয়ের সবটা [illegible] নিয়োজিত করিতেছি,—চল, ঐ পুণ্যময় তীর্থে উপনীত হইয়া জীবনের অভিসম্পাৎ বিমোচন করি।"

ক্ষীণপ্রাণ আমিনা নবজাত শিশুকে বক্ষে লইয়া এবং স্বামীর বক্ষে আপন অবশ স্কন্ধের ভর দিয়া, আশার উত্তেজনায় কোনরূপে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সত্য, তিনি [illegible]ই দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়াছেন যে, বিনা বাহনে, তাঁহার এক-পা চলাও কঠিন। কেবল শান্তিময় হ্রদ দেখিয়া, আশার বশে, যে একটু চলিতেছেন। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি রমণী বলিয়াই তাঁহার এই অসামান্যা শক্তি।

বলিয়াছি, অনুমান অর্দ্ধক্রোশ সম্মুখে ঐ আনন্দময় হ্রদ বিরাজিত। কিন্তু, এ কি এ! পর্য্যটকদ্বয়ও ত প্রায়-অর্দ্ধক্রোশ পথ [illegible]তিক্রম করিয়া আসিলেন,—তবুও ত যথাস্থানে পঁহুছিতে পারিলেন না? কেন এমন হইল? তবে কি,

সম্মুখে পাহাড় দর্শনের ন্যায়, এই হ্রদ দেখিয়া মরুভূমিস্থ পথের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ভুল হইল ?

অর্দ্ধস্ফুট কাতরতার সহিত আমিনা কহিলেন, "কৈ, নাথ, এখনও ত ঐ পুণ্যতীর্থে পঁহুছিতে পারিলাম না ?—আর কতদূর ?"

উৎসাহভরে ঘিয়াস উত্তর দিলেন, "প্রিয়ে এই পঁহুছিলাম বলিয়া। সাধ্বি, আর একটু ধৈর্য্য ধর।"

ঘিয়াস মুখে এইরূপ উৎসাহ বাক্যে সহধর্ম্মিণীকে আশ্বস্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনেও এই প্রশ্ন জাগিল,—"হাঁ, তাই ত! এ, কি এ ? পথ যে কিছুতেই ফুরাইতেছে না ? পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছি,—প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ চলিয়া আসিলাম,—এখনও ত সেইরূপই দেখিতেছি ? ঠিক তত পথ বলিয়াই এখনও যে মনে হইতেছে! তবে এ, কি ?—এঁ্যা !"

এই ভয়বিস্ময়সূচক "এঁ্যা" কথাটি তাঁহার মুখ দিয়া এরূপ ভাবে নিঃসৃত হইল যে, তাঁহার সঙ্গিনীও তাহা শুনিয়া ভীত হইলেন।—"এঁ্যা! তবে কি আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হইলাম? তবে কি—"

অমনি ঘিয়াসের চমক হইল; বুঝিলেন, পশ্চাতে—তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কেবলমাত্র আশায় জীবিতা,—শিশুক্রোড়ে তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী!

আর মুখে কিছু না বলিয়া, বুঝি মনেও কিছু ভাবিতে সাহস না করিয়া, তিনি কেবলমাত্র জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাসে বুঝি তাঁহার বুকের এক ঝলক রক্ত শুকাইয়া গেল।

ঘিয়াসের সেই মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাসের উত্তাপ আর একটি প্রাণীর গায়ে লাগিল,—তিনি তাঁহার সেই ছায়ারূপিণী সহধর্ম্মিণী আমিনা। আমিনা স্বামীর সে উষ্ণ নিশ্বাসস্পর্শে কম্পিতা হইয়া উঠিলেন। সেই কম্পিতাবস্থায় কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,

"স্বামিন্! তোমার মনে কি ভাব জাগিতেছে—আমি অৰ্দ্ধাঙ্গিনী,—আমায় বল! দেখ, আমি তোমার মুখ দেখিয়া যেন সকলই বুঝিতে পারিতেছি! বল নাথ, বল, যে বিপদ অ[illegible]শ্যম্ভাবী,—তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হও কেন? আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী,—অনুগতা, শিষ্যা, দাসী;—তোমার

আশীর্ব্বাদে আমি সকলই সহিতে পারি, সকলই সহিতে পারিব ;—তুমি সচ্ছন্দে বল।—ঐ দেখ, সেই শান্ত স্নিগ্ধ মনোহর বিশ্রাম-নিকেতন,—ঠিক সেই ভাবেই আমাদের সম্মুখে বিরাজিত; ঐ দেখ, সেই মহিমাপূর্ণ জনস্থলী, সেই আনন্দ আশ্রম,—ঠিক তেমনই ভাবে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। দেখ দেখ, ঐ মহাতীর্থ—ঐ পুণ্যময় হ্রদ ক্রমেই অধিকতর মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের হৃদয় মন আকর্ষণ করিতেছে ;—সকলই ঠিক, সকলই সত্য, সকলই প্রত্যক্ষীভূত; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেখ দেখ, উহার দূরতা এখনও ঠিক সমান,—ঠিক পূর্ব্ববৎ।—এখনও যেন ঠিক সেই অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধান ;—আমরা যেন একপদ স্থানও অতিক্রম করি নাই!—নাথ, এ কি, এ! এ কি মায়া?"

"মায়া"—সতীর মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র, কে যেন শূন্যে প্রতিধ্বনি করিল,—"মায়া"।

ঘিয়াসও আপনমনে চমকিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—"মায়া!"

হায়! এই তিন "মায়া"-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে,—

সেই মনোহর, নয়নানন্দ, প্রীতি-প্রফুল্লতাময় হ্রদ,—হ্রদ-তীরস্থ বৃক্ষরাজী, সেই নবতৃণাঙ্কুর শোভিত বেলাভূমি, সেই আনন্দময় নগরদ্বার, সেই জন-সমাগম,—সমস্তই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। যেন কোন্ অদৃশ্য, অপরিজ্ঞাত যাদুকর, অদ্ভুত যাদুমন্ত্রে, ফুৎকারে কোথায় সব উড়াইয়া দিল! ঘনাকার নিবিড় কুজ্ঝটিকা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইল, এবং সেই স্থানে প্রচণ্ড মরুর প্রচণ্ড সূর্য্য ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তের অভিনয়, মুহূর্ত্তেই শেষ!

জড়প্রকৃতি হো হো অট্টহাস করিয়া উঠিল;—ঘূর্ণী বাতাস ভীমবেগে বালুকা রাশি লইয়া আকাশে ঘুরিতে লাগিল;—চারিদিক ধূলিময় হইয়া গেল;—একটা বিকট মরু-পক্ষী দুর্ভাগ্য দম্পতীর মাথার কাছ দিয়া যেন উপহাসচ্ছলে বিকট চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল। ঘিয়াস ও তদীয় পত্নীর জীবন-নাটকের এক ভীষণ অভিনয় হইয়া গেল।

ঘিয়াস নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, ভীতিগ্রস্ত, বিস্ময়-বিহ্বল,—প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া; কোমলপ্রাণা

আমিনা চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া, বক্ষে শিশুকন্যা-সহ ভূতলে মূর্চ্ছিতা।

তখন সেই ভীষণ মরুভূমি ভীষণ শূন্যতা ও অনন্ত বালুকারাশি বুকে লইয়া, অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া ধূ-ধূ-ধূ জ্বলিতেছে ;—আর কেহ কোথাও নাই।

এই কি ইন্দ্রজাল, না আর কিছু? ইন্দ্রজাল নহে,—আর কিছুই বটে। ইহারই নাম, মায়া-মরীচিকা, মৃগতৃষ্ণিকা, মরু-বিভীষিকা!—হায় পৃথিবি! তোমার বুকে এত রহস্যও নিহিত আছে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড় বিপদ, নিরাশা ও দুঃখ-কষ্টের পর আশার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, ভাগ্যদোষে পুনরায় সেই আশায় নিরাশ হইলে যে কি কষ্ট, কি প্রাণঘাতিনী যন্ত্রণা হয়, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে অন্যে বুঝিবে না। ঘিয়াসের যে কি কষ্ট ও মর্ম্মদাহ হইতে লাগিল, তাহা ঘিয়াসই বুঝিলেন।

কিন্তু হায়, এমনই ভাগ্য-বিপর্য্যয় যে, সেই মর্ম্মদাহও তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগ করিতে পারিলেন না।—মর্ম্মদাহ ভোগ কি তবে সুখের একটা উপাদান? সুখের উপাদান না হউক, বড় দুঃখেও একটু নির্ম্মল আরাম আছে।—সেই আরাম-ভোগও ঘিয়াসের ভাগ্যে ঘটিল না;—সম্মুখে তাঁহার প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণী মূর্চ্ছিতা।

মর্ম্মাহত অন্তরে ঘিয়াস মূর্চ্ছিতা সহধর্ম্মিণীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। শিশুকন্যাকে বক্ষে লইয়া নিজ উত্তরীয় দ্বারা শিশুমাতাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হা কপাল! এমন এক বিন্দুও জল নাই যে, মূর্চ্ছিতা বনিতার মুখে অর্পণ করেন! কপালে করাঘাত পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটি পান্থপাদপ বৃক্ষ রহিয়াছে। তখনই একটি পাত্রে করিয়া সেই বৃক্ষের কিয়দংশ নির্যাস লইয়া আসিলেন এবং মূর্চ্ছিতার মুখে চোকে অর্পণ করিলেন। শিশুকন্যাটি বক্ষেই স্থাপিত ছিল।

মূর্চ্ছিতা আমিনা ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। তাঁহার অপাঙ্গ বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি এত দুর্ব্বল ও কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কিয়ৎকাল তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূরণ হইল না।

সতী কষ্টে বাহু প্রসারণ করিলেন; ইঙ্গিতে আপন শিশুকন্যাকে বক্ষে লইতে চাহিলেন; ঘিয়াস ধীরে ধীরে কন্যাকে অর্পণ করিলেন।

আশ্রয় নাই, সম্বল নাই, জীবনধারণের কোন-মাত্র উপায় নাই,—নিরুপায় ঘিয়াস প্রতিক্ষণে অগতির গতি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, একযোগে তিনটি প্রাণীরই প্রাণ বহির্গত হইবে।

আমিনা ধীরে ধীরে উঠিয়া ব[illegible]লেন। অতি কষ্টে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "নাথ, আর ভাবিতেছ কি? শেষগতি ত অনিবার্য্য; তবে আর একবার শেষচেষ্টা করিয়াই দেখি চল।"

আশা ফুরাইলে মানুষ যাহা হয়, ঘিয়াস তাহাই হইলেন। দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গম্ভীরস্বরে সহধর্ম্মিণীকে কহিলেন, "প্রিয়ে, তবে উঠিয়া দাঁড়াও [illegible] চল, প্রতিপদে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করি[illegible] করিতে যাই।—হায়, দুর্ভাগ্য শিশু! সময়[illegible] তুমিও বাদ সাধিলে!"

বস্তুতঃ, বক্ষে শিশু লইয়া মুমূর্ষু [illegible]মিনার পথ-চলা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। তবুও তিনি প্রগাঢ় বাৎসল্য-স্নেহে, একরূপ জীবন্মৃত হইয়াই, সেই প্রচণ্ড মরু পার হইতে লাগিলেন।

বড় কষ্টে, বড় কাতরতায় এরূপ হাসি আসে। আমিনা সেই কাতরতার একটু হাসি হাসিয়া স্বামীকে কহিলেন,

"ভগবানের এ কেমন মার্? গভীর নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে আশার উজ্জ্বল আলোক দেখাইয়া কেন তিনি বিপন্ন জনকে অধিকতর বিপন্ন করেন? এ তাঁর কিরূপ লীলা,—কেমন মহিমা? এই ভীষণ মরুভূমে আমরা ত মরিতেই বসিয়াছি; তবে আবার এ মরণের পথেও তাঁর এ চাতুরী কেন? কি কারণে, কোন্ ইষ্টসিদ্ধিতে তাঁর এই ক্ষণিক মায়া-হ্রদ সৃজন,—ভূতলে এই নন্দনকাননের অবতারণ? কেন এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়া তিনি তাঁর দুর্ব্বল বিপন্ন সন্তানকে ব্যথিত ও মর্ম্মাহত করেন? মূঢ়া রমণী আমি,—বুঝি না, তিনি কেমন দয়াময়!"

ঘিয়াস একটি নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন,

"প্রিয়তমে, তিনি যে প্রকৃতই দয়াময়, তাহার আর কথাটি নাই। এই যে মরীচিকা ও মৃগ-তৃষ্ণিকা দেখিয়া আমরা প্রবঞ্চিত হইলাম, ইহারও কারণ আছে। আমরা অনেক আশা লইয়া দেশা-

স্তরে যাইতেছি, অন্তর্য্যামী পূর্ব্ব হইতে একটু সঙ্কেত করিয়া রাখিলেন। বেশী আশা করিলেই যে বিড়ম্বিত হইতে হয়, এই শিক্ষাটি দিলেন। অথবা,আর এক হিসাবে,এ সমগ্র বিশ্ব-সংসারটাই ত ঐরূপ মায়া-মরীচিকাময়! অল্পবুদ্ধি সংসারী চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকে—দেখিতে জানে না,তাই বুঝিতে পারে না, তার সাধের সংসারটাও ঐরূপ ইন্দ্রজালে জড়িত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ মায়া-হ্রদ, ঐ মৃগতৃষ্ণিকা, ঐ স্বচ্ছ সলিলরাশি;—এ সকলই আমাদের কল্পনাপ্রসূত। আমরা মনের কল্পনায় আপনা আপনিই এই হ্রদ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরাজী রোপণ করিয়াছিলাম,—অদূরে জনপদ বসাইয়া ছিলাম;—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকলের কোন অস্তিত্বই ছিল না;—এ সমস্তই আমাদের মনের বিকৃত কল্পনা অথবা উদ্দাম বাসনার ফল। যেমন স্বপ্নে কেহ আমীর হয়, উজীর হয়, ফকির হয়—এও ঠিক তাই।—হায়, এই স্বপ্ন সত্য হইয়া জাগ্রৎ অবস্থাটাই যদি স্বপ্ন হইত!—আর একপক্ষে, এইরূপ হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম—কেন না প্রকৃতি মায়া-

ময়ী। মায়ার জীবকে প্রলুব্ধ করাই তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম।—ইঁহাতে স্রষ্টার কোন হাত নাই। তোমার আমার ভাগ্যে এই মায়া-হ্রদে বিভ্রাট ঘটিল বটে; কিন্তু বহু ভাগ্যবান্ আবার এই আশাময়ী মায়াকে কাণ্ডারী করিয়াই জীব-যুদ্ধে জয়লাভ করে।—অনেক শ্রমক্লিষ্ট দীর্ণ-প্রাণ পথিক ও তৃষাতুর পর্য্যটক,—আবার এই মৃগ-তৃষ্ণিকা দেখিয়াই আশার উল্লাসে এই দুর্গম মরু পার হয়!—প্রিয়ে,সকলই ভবিতব্য!—আমাদের অদৃষ্ট মন্দ; ভগবানের দয়াময় নামে অবিশ্বাসী হই কেন?"

আমিনা। স্বামিন্! ক্ষমা কর,—অবিশ্বাসী হই নাই,—তবে কিছু বিস্মিত হইয়াছি বটে।

ঘিয়াস। হাঁ, বিস্ময়েরই কথা বটে।—এম-নই মূর্খ আমি,—নিঃসম্বলে বনিতার হাত ধরিয়া মরুভূমি পার হইতে বসিয়াছি, আর মরুভূমির এই বিষম মরীচিকা-রহস্যটা আদৌ জানিতাম না। তা যে শিক্ষা আজ পাইলাম, যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, ত জীবনে ইহা বিস্মৃত হইব না।"

দুর্ভাগ্যদম্পতী, পুনরায় আশার ছলনায়, বড়

কষ্টে, অতি ধীরপদে চলিতেছেন; অতি কাতরতার সহিত সেই ভীষণ প্রান্তর পার হইতেছেন; কিন্তু পা আর চলে না। বিশেষ, আমিনা এত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে, শিশুকন্যা বক্ষে লইয়া মরু-পার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি দুই চারি পা যান, আর এক একটা মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিয়া থমকিয়া দাঁড়ান। ক্ষুৎ-পিপাসায় তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত; দুঃসহ পথ-কষ্টে তিনি অবসন্ন।—কাতরনয়নে এক একবার বক্ষস্থ শিশুকে গভীর অনুরাগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। মাথার উপর সেই প্রদীপ্ত [illegible] ত্রলোচন; পদতলে সেই উত্তপ্ত অনন্ত বালুকারাশি।

অবসন্ন দেহে যতটুকু বল ছিল,—নির্জ্জীব-জীবনে যে টুকু শক্তি ছিল,—সবটা শক্তি ও বল একত্র করিয়া, যেন পায়ের পর পা গণিতে গণিতে, আমিনা অতি অল্প পথই গেলেন; গিয়া বসিয়া পড়িলেন। অরুন্তুদ যন্ত্রণায় এবার তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিদারুণ পিপাসায় জিহ্বা উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে; অনাহারে সর্ব্ব-শরীর অবশ—অসাড় হইয়া পড়িয়াছে;—শিশু-

কন্যাকে বক্ষে লইয়া আর এক-পাও চলিবার সামর্থ্য তাঁহার রহিল না।

হতভাগ্য ঘিয়াস অতি কষ্টে সহধর্ম্মিণীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলেন। তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনিও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাথার ভারটি নামাইয়া, সেই উত্তপ্ত বালুকা-রাশির উপর বসিয়া পড়িলেন।

কিন্তু হায়, দুই মুহূর্ত্ত কাল বসিয়া অতিবাহিত করিবার স্থান ইহা নয়। মাথার উপর জ্বালাময় সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ; নিম্নে—পৃথিবীর উত্তাপ ততোধিক।

ঘিয়াস মুহূর্ত্তকাল নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ রুদ্ধশ্বাস হইয়া বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ডাগর চক্ষু দুটি দিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা গরম রক্ত পড়িল। তিনি মুখ তুলিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পত্নীর প্রতি চাহিলেন। সেই বিস্ফারিত চক্ষে শিশুকন্যাকেও একবার দেখিলেন। তারপর পরিষ্কারকণ্ঠে সহধর্ম্মিণীকে কহিলেন, "প্রিয়ে, বড় গুরুতর সঙ্কল্প করিয়াছি; হৃদয়কে দৃঢ় কর।"

ঘিয়াস এরূপ দৃঢ়তার সহিত কথা কয়টি কহিলেন যে, আমিনা ভীত হইলেন। তিনি অতি ত্রস্তভাবে শিশুকন্যাকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অপরাধীর ন্যায় স্বামীর পানে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন; মুখে কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না।

ঘিয়াস বলিলেন, "প্রিয়ে, বড় বিষম সঙ্কল্প করিয়াছি; তোমাকে সবিশেষ বলিয়া বুঝাইয়া এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব,—তাহার সময় নাই। প্রাণাধিকে, দৃঢ় ও কঠিন হও। জননীর স্নেহ হৃদয় হইতে উন্মীলিত কর!"

এবারও আমিনা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ বিস্মিত হইয়া স্বামীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ঘিয়াস পুনরায় কহিলেন, "প্রিয়তমে, বিস্মিত হইতেছ? অসাধ্য ভাবিতেছ? অসম্ভব মনে করিতেছ?—হায়! মনুষ্য-জীবনে অসাধ্য ও অসম্ভব কিছুই নাই। মাথার উপর ঐ দেখ, প্রচণ্ড জ্বলন্ত সূর্য্য;—সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে চাহিয়া দেখ, অসীম মরু-প্রান্তর অনন্ত বালুকারাশি বুকে লইয়া, অগ্নি-স্পৃষ্ট হইয়া ধূ-ধূ জ্বলি-

তেছে।—এই ভীষণ প্রান্তর নিঃসম্বলে পার হইতে হইবে।—ওহো, চক্ষু মুদিয়া একাগ্রমনে প্রকৃতির গম্ভীর আবেদন শ্রবণ কর,—'অগ্রে আত্মরক্ষা, পরে আর যা কিছু।'—প্রিয়ে, আবার বলি, মনুষ্যজীবনে অসম্ভব কিছুই নাই।"

এবার আমিনা কম্পিতবক্ষে, চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া, বসিয়া পড়িলেন।

পরিষ্কারকণ্ঠে, দৃঢ়তার সহিত ঘিয়াস আবার বলিলেন, "উঠ উঠ প্রাণাধিকে! বড় বিষম সময় উপস্থিত। কঠিনতা—কঠোরতা—নির্ম্মমতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। হৃদয় হইতে স্নেহ, মমতা, প্রেম, অনুরাগ, ভালবাসা,—সকলই বিসর্জ্জন করিতে হইবে। স্মৃতিমূলকে বিশুষ্ক করিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, বিস্মৃতিকে আত্ম-সমর্পণ কর। নচেৎ রক্ষা নাই, উপায় নাই।—স্বপ্নে যে অপার্থিব নিধিকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলে,—এখন স্বপ্ন অন্তর্হিত হইয়াছে,—সেই নিধিকে জন্মের মত ভুলিয়া যাও!"

"এঁ্যা!"

"বিস্মিত হইও না, অসম্ভব মনে করিও না।

ইহাই তোমাকে করিতে হইবে।—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ঐ দেখ, মাথার উপর প্রদীপ্ত সূর্য্য সহস্র আঁখি বিস্তার করিয়া ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে; ঐ দেখ, ভীষণ মরুভূমি করাল মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে; ঐ দেখ চারিদিকের নীরবতা ও ভীষণতা কি গভীর বিভীষিকা দেখাইতেছে।—প্রিয়তমে, আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হও। ঐ শুন, জড়প্রকৃতির হো-হো অট্টহাস; ঐ শুন, বাতাসের সোঁ সোঁ রব; সম্মুখে ঐ দেখ, মৃত্যুর বিকট ছায়া!—প্রিয়ে, আর কেন স্নেহ-মমতা? আর কেন মায়ার বন্ধন? আর কেন স্মৃতির সুখ-স্বপ্ন? আত্মরক্ষা কর—বুকের ধন বুক হইতে অপসারিত কর।”

আমিনা কাঁদিয়া উঠিলেন। ঘি:াস কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, “সতি! কাঁদিও না। দেখ, এ ভীষণ প্রান্তরে, অসহ যে দুই জনের মৃত্যু অপেক্ষা একের মৃত্যু বরং বাঞ্ছনায়। চঞ্চল হইও না, মুখ বিবর্ণ করিও না।—ঐ শুন, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য আহ্বান!—প্রিয়ে, আত্মরক্ষার্থে প্রাণ-পুত্তলিকে পরিত্যাগ কর!”

মায়ের প্রাণ কি এ প্রবোধ মানে? পৃথিবী ঘোরে কতদূর? মা বুঝি সে পৃথিবী ছাড়িয়াও আপন মনোময় বিশ্বে সন্তানকে রাখিতে চান।—আমিনা কি মনে করিয়া নিদ্রিত শিশুকে বক্ষে লইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নবপ্রসূতা ব্যাঘ্রী, যেমন তাহার শাবককে কেহ লইতে আসিলে, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে উঠিয়া দাঁড়ায়, সেইভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অর্দ্ধক্ষিপ্তবৎ কঠোরকণ্ঠে স্বামীকে কহিলেন,—"চল।"

'চল'—উন্মাদিনীর এই কঠোর কণ্ঠস্বর ঘিয়াসের কাণে বাজিল। 'চল'—এই আড়ম্বরহীন গম্ভীর বাক্যে ঘিয়াস যন্ত্রপুত্তলিবৎ নির্ব্বাক হইলেন। 'চল'—সতীর এই একমাত্র সঙ্কল্পসিদ্ধ তেজোময়ী কথায় ঘিয়াস চমকিত হইলেন।

আমিনার সেই বিস্ফারিত নয়ন, সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মুখাবয়ব, সেই উন্মাদিনী মূর্ত্তি,—ঘিয়াস জীবনে আর কখন দেখেন নাই। তাঁহার এই পৌরুষব্যঞ্জক কঠোর স্বরও কখন শুনেন নাই। আজ এই বিজনে, এই ভীষণ মরুভূমে তাহা শুনিলেন ও দেখিলেন। দেখিয়া এবং শুনিয়া

তিনি ভীত হইলেন। বুঝিলেন, আমিনা এখন জননীর হৃদয় পাইয়াছে। সন্তানের প্রতি জননীর যে এত টান, তাহা ঘিয়াস জানিতেন না। বুঝিলেন, তাঁহার এতটা আত্মপ্রকাশ করা উচিত হয় নাই। পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিলেন, একযোগে স্ত্রী ও কন্যা,—দুইজনকেই হারাইতে হইবে।

কথা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুর্ভাগ্য দম্পতী আবার পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। স্বভাবের গতি রোধ করে কার সাধ্য? অতি অল্পমাত্র পথ গিয়াই আমিনা আবার বসিয়া পড়িলেন। এদিকে দারুণ উত্তাপে নবজাত শিশুর কোমল কণ্ঠ মুহুর্মুহু বিশুষ্ক হইয়া উঠিতে লাগিল। শিশু কাঁদিতে আরম্ভ করিল। শিশুমাতা স্বভাবসিদ্ধ বাৎসল্য-বশে অনুরাগভরে শিশুকে স্তনপান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন;—কিন্তু হা অদৃষ্ট! স্তনে সে অমৃত-ধারা কোথায়? অনাহারে, পথশ্রমে, প্রতিক্ষণে মৃত্যুবৎ নৈরাশ্যে মুমূর্ষু আমিনার দেহের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে,—স্তনে সে দুগ্ধ কোথায়? এবার আমিনা কম্পিতকণ্ঠে আপন মনে বলিলেন,

তিনি ...বে কি সত্যসত্যই স্বামির ...ফল হইবে ? সত্যই কি এ দুর্ভাগ্য শিশুর প্রাণরক্ষা, বিধাতার ইচ্ছা নয় ?"

আমিনা আপনমনে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। পাষাণে বুক বাঁধিয়া, বুঝি পাষাণী হইয়া, চিন্তা করিলেন। প্রকৃতির অলজ্য আহ্বান এবার তাঁহার কাণে বাজিল। প্রাণেও সেই স্বর পঁহুছিল। বুঝিলেন, মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় স্বামী...কে কঠোরকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া অপরাধিনী হইয়াছেন।

তীক্ষ্ণ অনুভবক্ষম ঘিয়াস সহধর্ম্মিণীর এই নীরব আত্মানুশোচনা বুঝিলেন। তিনি মহানুভব; স্ত্রীর প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হন নাই।—এখন যে আমিনা আপনা হইতে তাঁহার সঙ্কল্প অনুমোদন করিতেছেন, তজ্জন্যও মনে মনে এতটুকু গর্ব্বিত বা আনন্দিত হন নাই;—বরং এবার যে সত্য সত্যই আমিনার জীবনাধিক মমতার ধনকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি কিছু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তবে সহিষ্ণুতার অবতার তিনি,—বিহ্বলতাবশে আত্মসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না।

তখন স্বামী-স্ত্রীতে শোক-দুঃখের অনেক কথা হইল। সে কাহিনীতে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এবং বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের অনেক স্মৃতি জড়িত রহিল;—শেষে এই মরুভূমে কন্যা বিসর্জ্জনই স্থিরযুক্তি হইয়া গেল।

তখন মধ্যাহ্ন কাল। সেই মধ্যাহ্নকালীন প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মি তখন কি ভাবে সেই বিশাল মরুভূমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল,—পাঠক কল্পনা-নয়নে একবার সেই দৃশ্যটি দেখুন।

আমিনা আপন বিশুষ্ক স্তন কন্যার মুখে দিলেন। সেই স্তন হইতে যে অত্যল্প ক্ষীণধারা বাহির হইল, কন্যা সেই অমৃতাস্বাদনে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন আমিনা অশ্রুসিক্ত নয়নে কন্যার চাঁদ মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সে চক্ষের পলক বুঝি আর পড়ে না। তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র মথিত হইতে লাগিল। তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন।

ঘিয়াসও নির্নিমেষ নয়নে এই করুণদৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন, "না, আর নয়,—এই অবসর। শিশু ঘুমাইয়াছে; এই অবসরে রাক্ষসের হৃদয় লইয়া, এই নিদ্রিতাবস্থায়,

শিশুকে জননীক্রোড় চ্যুত করি। বিলম্বে আবার মমতা আসিতে পারে।"

ঘিয়াস আমিনাকে ইঙ্গিত করিলেন। অর্দ্ধ-ক্ষিপ্তা শিশুমাতা তখন গভীর অনুরাগভরে প্রাণ-পুত্তলিকে শেষ-আলিঙ্গন করিলেন এবং ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিলেন,

"ঘুমাও শিশু,—প্রাণ ভরিয়া ঘুমাও;—রাক্ষসী জননী তোমাকে এই ঘুমন্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করিবে। এ বিজনে কে আছ পিশাচি,—কে আছ অশরীরী প্রেতিনি, এস এস; জননী-হৃদয় পাষাণে গঠিত করিয়া দাও,—সে আজ ঘুমন্ত শিশুকে আপন কোল হইতে বিসর্জ্জন করিবে।"

ঘিয়াস নির্ব্বাক্, আনমনা, কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ;—আমিনা আত্মহারা, শোকবিহ্বলা, উন্মাদিনী।

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে।

আমিনা কাঁদিলেন, ঘিয়াসও কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার সঙ্কল্পসাধনে মনোযোগী হইলেন। তখন আমিনা ক্রোড়স্থ শিশুকে উদ্দেশ

করিয়া কহিলেন, "ওরে দুঃখিনীর সন্তান! কেন তুই এ জ্যোতির্ম্ময় রূপ লইয়া এ মরুভূমে জন্মগ্রহণ করিলি?—এ আশ্রয়হীন ভীষণ প্রান্তরে কেন তোর এই রূপ-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল?—তবে যাও, মা আমার! এইরূপ ঘুমাইতে ঘুমাইতে, জননীর কোল শূন্য করিয়া যাও,—স্বর্গভ্রষ্ট, শিশু!—যেখানে তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অরক্ষিতাবস্থায় দেখিয়া, জড়প্রকৃতিও নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে!"

পাষাণপ্রাণে জননী কন্যাকে বক্ষঃ হইতে অপসারিত করিলেন; পাষাণপ্রাণে পিতা কন্যাকে অদূরে বিসর্জ্জন করিতে গেলেন। পাষাণপ্রাণ মরুভূমি অবিচলিত হৃদয়ে এই নির্ম্মম দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সোণার শিশু জন্মশোধ জননী কক্ষ্যচ্যুত হইল। সেই কক্ষ্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনী আমিনাও চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া পুনর্মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

ঘিয়াস তখন একরূপ বাহ্যজ্ঞান রহিত। পত্নীর এ দৃশ্য দেখিয়াও তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। ভাবিলেন,

"না, যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন কার্য্য শেষ করিব। মারিতে বসিয়া আর মায়া কেন? হায়, মন্দভাগ্য শিশু! ঘুমাও, ঘুমাও,—অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাক! এ ঘুম যেন তোমার আর না ভাঙ্গে! ঐ পৃথিবীর আলো যেন তোমায় আর দেখিতে না হয়! এইরূপ ঘুমাইতে ঘুমাইতে, সুখ-স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, যেন তোমার মহানিদ্রা হয়! এ মাটীর পৃথিবী বড় কঠিন, মা! তুমি সে কঠিনতার সহিত যুঝিতে পারিবে না। ঘুমাও মায়ার জীব,—জাগরণই দুঃখের নিদান। সেই অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতে, পাপ দেহধারী আমরা,—এ পৃথিবীতে জাগিয়া রহিলাম।—হাঁ, এই সুযোগ,—অভাগিনী আমিনা মূর্চ্ছিতা।—মূর্চ্ছাভঙ্গে আবার মমতা আচ্ছন্ন করিতে পারে। প্রাণ, আরও কঠিন হও।—যাও শিশু, নৃশংস পিতার কঠিন হস্ত হইতে এইরূপ ঘুমাইতে ঘুমাইতে,—মহানিদ্রার সেই মহাভাব আয়ত্ত করিতে করিতে, সেই পুণ্যময় শান্তিলোকে যাও;—এ নির্ম্মম পৃথিবী তোমার উপযুক্ত স্থান নহে!—একি, প্রাণ যে আবার আর্দ্র হইতেছে!"

ঘিয়াস ঝটিতি সেই ছত্রটিতে পূর্ব্ববৎ সেইরূপ একটি তাম্বু প্রস্তুত করিলেন এবং মূর্চ্ছিতা বনিতাকে বেষ্টন করিয়া সেই তাম্বুটি রক্ষা করিলেন।—মাথার উপর সেই প্রদীপ্ত সূর্য্য পূর্ব্ববৎ জ্বলিতেছিল।

অর্দ্ধক্ষিপ্ত ঘিয়াস শিশুকন্যাকে স্কন্ধোপরি স্থাপিত করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এক মরু-বৃক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং সেই বৃক্ষের কতকগুলি পত্র সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষের মূলদেশে স্থাপিত করিলেন। তার পর স্বহস্তে নিজ হৃৎপিণ্ড ছেদন স্বরূপ—সেই প্রাণপ্রতিম সোণার শিশুকে সেই ম্লান ছায়াযুক্ত পত্রোপরি স্থাপিত করিলেন। এবং তারপর অতি কষ্টে, কম্পিত-বক্ষে, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যার দেহোপরি আরও কতকগুলি পত্র আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। গভীর অনুরাগভরে, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে, পলকহীন হইয়া এবং শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তিনি শিশুকে দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত হইল,—ঘিয়াস তদবস্থায়, চিত্রাঙ্কিত স্থিরনেত্র, শ্বাসরুদ্ধ, এবং অবিকম্পিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন চমক ভাঙ্গিল,তখন সর্ব্ব শরীর মথিত করিয়া একটি সুগভীর, মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস পড়িল এবং সেই নিশ্বাসের সহিত, বুক ফাটিয়া কোটা কয়েক গরম রক্ত চক্ষু দিয়া নির্গত হইল। পরিত্যক্ত শিশুকে উদ্দেশ করিয়া ঘিয়াস কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,

"হায় স্বর্গভ্রষ্ট সোণার শিশু!—কি নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তোমার!—পিতা হইয়া, তোমার ঘুমন্ত অবস্থায় আমি তোমায় জননী-কোলভ্রষ্ট করিলাম!—অকালে তুমি কীটদষ্ট হইয়া বৃন্তচ্যুত হইলে! থাক মা, এই নির্জ্জন মরুভূমে—জড়প্রকৃতির সাহচর্য্যে; যদি সেই বিশ্বনিয়ন্তার দয়া হয়, তবে চাই কি, এই সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায়ও তোমার গতি হইতে পারে। তাঁহার দয়ায় রাজাসনে রাজা এবং বিজন প্রান্তরে ক্ষুদ্র কীটাণু তুল্যরূপে জীব-জন্ম ভোগ করিয়া থাকে।—মা আমার! প্রকৃতির অলজ্ঞ্য গতিতে তোমার স্বার্থান্ধ অক্ষম জন্মদাতা আজ নিরুপায়ে তোমায় বিসর্জ্জন করিয়া চলিল।—আশীর্ব্বাদ করি, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বদর্শীর জাগ্রৎ আঁখি তোমার উপর অর্পিত হউক।"

রক্তমাংসের শরীর ঘিয়াস আর অধিকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না ;—শিশুকন্যা তখনও বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। এই শোচনীয় করুণ দৃশ্য দর্শনে তাঁহার বুকের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি অবিলম্বে সেই পরিত্যক্ত শিশুর সর্ব্বাঙ্গ পত্রাচ্ছাদিত করিলেন ;—মরুভূমির প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ যতটুকু তাহা হইতে নিবারিত হইতে পারে। কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মুখটি বাহির করিয়া রাখিলেন। শ্মশানে প্রাণাধিককে লইয়া যাইবার সময়, কোন কোন দুর্ভাগ্য, সত্য সত্যই এই ভাবে মনকে প্রবোধ দেয়।

ভাঙ্গাবুকে, ত্বরিতপদে ঘিয়াস সে স্থান ত্যাগ করিলেন। কিছুদূর গিয়া দাঁড়াইলেন ; আবার ফিরিলেন ;—পরিত্যক্তা কন্যার চাঁদমুখখানি আর একবার দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষসন্নিকট আসিলেন ; ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষ পত্রগুলি সরাইলেন ; তার পর ধীরে ধীরে সেই অনিন্দ্যসুন্দর নিদ্রিতা জ্যোতির্ম্ময়ী শিশুকন্যাকে বক্ষে স্থাপিত করিয়া,

গভীর অনুরাগভরে ধীরে ধীরে তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

এই মধুর চুম্বনে ঘিয়াসের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। অতীতের অনেক স্মৃতি তাঁহার জাগিয়া উঠিল। স্নেহবিহ্বল হইয়া গদগদ স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"কি অমৃত, কি মদিরা! একাধারে এত শীতলতা, এত উত্তাপ! এই ক্ষুদ্র শিশু-অধর এত শক্তি ধরে? এই জন্যই কি গৃহী পিতা মাতা সর্ব্বস্ব ভুলিয়া, আপনা হারাইয়া, সন্তান-বাৎসল্যে এত অভিভূত হয়? কি সর্ব্ববিস্মৃতিকারিণী মৃত-সঞ্জীবনী মায়া! পরকাল যাহা হয় হোক্,—জন্ম জন্ম এই মায়া-পিঞ্জরে বন্দী হইতে সাধ যায়!—হায় অভাগিনী আমিনা! আমি তোমার মুখ এতটুকুও চাহিলাম না,—করাল কৃতান্তবেশে তোমার বুকের নিধিকে বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিলাম!—একি, আমি পাগল হইলাম নাকি? আমিনাকে যে মূর্চ্ছিতদশায় ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি?"

ঘিয়াস কন্যাকে পূর্ব্ববৎ পত্রাচ্ছাদিত করিয়া

রাখিয়া, উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে পত্নী সমীপে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদূর গমনের পর, আবার কোন্ অজ্ঞাতশক্তি তাঁহার গতিরোধ করিল। ঘিয়াস থমকিয়া দাঁড়াইলেন। একবার পশ্চাৎ ফিরিলেন; অদূরস্থ সেই বৃক্ষপানে চাহিলেন; দুই একপদ অগ্রসর হইলেন; আবার কি ভাবিয়া দাঁড়াইলেন। গভীর বিষাদভরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,

"না, আর মায়া বাড়াইব না। আমার মনুষ্য-জন্মের চরম সুখ,—ইহলোকের একমাত্র শান্তি,—আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন—প্রাণপ্রতিম আমিনাকে মূর্চ্ছিতদশায় ফেলিয়া রাখিয়া আসি-য়াছি;—জানি না, এতক্ষণে অভাগিনীর কি দশা হইয়াছে!—না, এখন আর এখানে দাঁড়াইয়া বৃথা বিলাপ আমার উচিত হয় না। প্রকৃতির অলজ্ঘ আহ্বানে, যাহাকে বাঁচাইবার জন্য, নিরীহ মায়ার পুত্তলিকে বিসর্জ্জন করিলাম, সর্ব্বাগ্রে তাহাকে নিরাপদ করি।"

ঘিয়াস দ্রুতপদে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে পত্নী সমীপে উপনীত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, স্বাভা-

বিক গতিতে আমিনার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে,—
তিনি ভূমি হইতে উঠিয়া বসিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঘিয়াসের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য,—আমিনার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই!—তিনি অবিকম্পিতা, অরোরুদ্যমানা, অচঞ্চল। অথবা হায়, কে জানে, মূর্চ্ছাভঙ্গের পর, স্বামীর অনুপস্থিতির সময় টুকুতে তাঁহার শোকাশ্রু-প্রস্রবণ হইতে কি অজস্রধারে বারিপাত হইয়াছিল,—যদ্দ্বারা সেই বিশুষ্ক মরু-বালুকারাশিও আর্দ্র হইয়া গিয়াছে!

মুহূর্ত্তকাল আমিনা নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া স্বামীর পানে শূন্যদৃষ্টি করিয়া রহিলেন। তাঁহার কোল শূন্য; জীবন ভারাক্রান্ত; দেহ অবসন্ন;—মস্তক ঘুরিতে লাগিল; সেই সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীও বুঝি ঘুরিতে লাগিল।—সহসা তিনি একটা মূর্চ্ছা-

কম্পন অনুভব করিলেন। হায়, পৃথিবী ঘোরে কতদূর ?

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। আমিনা বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিলেন। যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, তখন দেখিলেন, স্বামীর উরুদেশে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত রহিয়াছে।

পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত; ক্ষুধায় দেহ অবশ; মর্ম্মদাহে স্নায়ু সকল শিথিল;—শোকবিহ্বলা, কাতরা, বিষাদিনী আমিনা সেই ভাবে স্বামীর উরুদেশে মস্তক রাখিয়া, নীরবে মানস-নয়নে শিশু-কন্যার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন; নীরবে আপন মনে তাহাকে কোলে লইতেছিলেন; নীরবে মধুর চুম্বনে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া স্তন পান করাইতেছিলেন;—সহসা তাঁহার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সহসা একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণী বাতাস,—তাঁহাদের সেই ছত্রে-বস্ত্রসংলগ্ন-আশ্রয়-বিশেষটি একেবারে উড়াইয়া লইয়া গেল।—সেটি গিয়া বিশ হাত অন্তরে পড়িল। অমনি চারিদিক হইতে উত্তপ্ত বালুকা-রাশি উড়িয়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ধূলিময় করিয়া

দিল। এবং মাথার উপর সেই প্রচণ্ড মরুর প্রচণ্ড সূর্য্য ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল।

ঘিয়াস সবিষাদে কহিলেন, "প্রিয়ে, যাহা হইবার হইয়াছে ; আর এ ভীষণ প্রান্তরে ক্ষণ-মাত্রও অপেক্ষা করা চলিবে না ;—চল, এইবার শেষচেষ্টা করি।"

"হাঁ, চল।—পিশাচী রাক্ষসী হইয়া কন্যা বিসর্জ্জন করিয়াছি ; এইবার চল, আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতে শেষ চেষ্টা পাই। মা হইয়া যখন আমি কোলের শিশু ফেলিয়া দিতে পারিয়াছি এবং ফেলিয়া দিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি, তখন আমার অসাধ্য কিছুই নাই।—চল নাথ, চল,—আর কোন আশঙ্কা নাই। আমি সত্যই পাষাণী হইয়াছি ;—এখন সহজে এ প্রান্তর পার হইতে পারিব।—হায়, মা পৃথিবি! এত কষ্ট ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিতে, তুমি রমণীকে তোমার বক্ষে স্থান দিয়াছিলে?"

সর্ব্বশরীর মথিত করিয়া আমনার চক্ষু হইতে কয় ফোঁটা গরম রক্ত পড়িল। কিন্তু হায়, সে রক্ত, চক্ষের নিমিষেই, তাঁহার সেই উত্তপ্ত ক্ষীণ

গণ্ডস্থল শুষিয়া লইল,—তাহা আর নিম্নে বহিতে দিল না!

শোকাতুর দম্পতী গাত্রোত্থান করিয়া উঠি-লেন। নীরবে, দুর্ব্বিসহ কষ্টে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রতি পাদক্ষেপে তাঁহাদের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল;—তথাপি মুখ ফুটিয়া কেহ একটি কথাও কহিলেন না, কহিতে পারিলেন না।

হায়, আর কি কথা কহিবেন?—এখন আর কোন্ কথা কহিতে পারেন? ঘিয়াস অগ্রে অগ্রে; আমিনা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী;—এক একবার গভীর অনুরাগভরে, আশাপূর্ণ নেত্রে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন,—যদি সত্য সত্যই কোন অশ-রীরী প্রাণী, দয়াবশে, তাঁহার পরিত্যক্তা কন্যাকে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লইয়া আসিতে থাকে?

সহসা মমতা-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। অতি কষ্টে কিয়দ্দূর গিয়াই আমিনা গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সে আর্ত্তনাদে আকাশ প্রতি-ধ্বনিত হইল। সেই ভীষণ নির্জ্জনতাময় কঠিন মরুভূমিও বুঝি আর্দ্র হইল। সবিস্ময়ে, ভয়বিহ্বল

হইয়া ঘিয়াস পশ্চাতে চাহিলেন; দেখিলেন, অরুন্তুদ ক্রন্দনে আমিনা সেই শূন্য মরু প্রতিধ্বনিত করিতেছেন।

ঘিয়াস করুণাপূর্ণ নেত্রে সহধর্ম্মিণীর পানে চাহিলেন। প্রবোধ দিবার কোন ভাষা তাঁহার মুখে আসিল না। বুঝিলেন, যে প্রকৃতির আকর্ষণী শক্তিতে আমিনা আপনা ভুলিয়া কন্যা বিসর্জ্জনে বাধ্য হইয়াছে, সেই প্রকৃতিই আবার এক্ষণে অন্য মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার গতিপথ রোধ করিতেছে। হায়, বনের পশুও যাহা উপেক্ষা করিতে পারে না, মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া, মা হইয়া, আমিনা কিরূপে সেই স্বভাবের গতি রোধ করিবে?

ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমিনা কহিলেন, "নাথ, আর আমার জীবনে সাধ নাই। এই মরুভূমেই আমাকে জীয়ন্তে সমাধিস্থ কর।—নচেৎ, এই মুহূর্ত্তেই আমার কন্যাকে আনিয়া দাও। আমি এখান হইতে আর উঠিব না;—উঠিবার সাধ্যও আমার নাই।—এই আমার শেষ শয়ন।—দোহাই তোমার, এ সময় আমার কন্যাকে আনিয়া একবার দেখাও।"

আমিনার সে ক্রন্দনের আর বিরাম নাই। ঘিয়াস বুঝিলেন, নিষ্ঠুর অদৃষ্ট এইরূপেই আপন আধিপত্য বিস্তার করিবে,—এবং এইরূপেই বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

তিনি আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, সেইখানেই, সেই ঘূর্ণীবায়ু-বিক্ষিপ্ত ভগ্নপ্রায় ছত্রটিকে অবলম্বন করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ সেইরূপ তাম্বু প্রস্তুত করিলেন এবং তন্নিম্নে একখানি গালিচা বিচাইয়া আমিনাকে তদুপরি শায়িত করাইলেন। কিন্তু হায়, একি!—এক ঝলক—দুই ঝলক—তিন ঝলক—মুমূর্ষু আমিনার মুখ দিয়া যে ক্রমেই রক্তমোক্ষণ হইতেছে!—সঙ্গে সঙ্গে যে একটু জ্বরও আসিল! ঘিয়াস কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"জগদীশ্বর! এ কি করিলে?"

ছিন্ন মেঘের কোলে ক্ষীণ বিদ্যুতের মত একটু ম্লান হাসি হাসিয়া আমিনা ধীরে ধীরে কহিলেন,

"ছি নাথ, কাঁদ কেন? এই দেখ, এখনও আমি বাঁচিয়া আছি। আমার কন্যাকে আনিয়া দেখাও,—হয়ত সত্য সত্যই আবার বাঁচিয়া উঠিব। দেখ, জীবনের সহিত যুদ্ধ করিয়া বড়

কষ্টে এখনও আমি বাঁচিয়া আছি।—এই দেখ, আমার ক্ষীণ পয়োধরে দুগ্ধ আসিয়াছে ;—আহা! মার আমার কচি ঠোঁট হইতে ঘুমন্ত অবস্থায় স্তন ছিনাইয়া লইয়াছি ;—আমার বড় সাধ, তাহাকে আর একবার স্তনপান করাই ;—স্বামিন্! আমাকে এ সাধে বঞ্চিত করিও না। বাছার চাঁদ মুখখানি আর একবার দেখিব ;—তাহাকে না দেখিয়া আমি জীবন বাহির করিব না,—করিতে পারিব না। প্রিয়তম, আর বিলম্ব করিয়া আমার অন্তিম-যন্ত্রণা বাড়াইও না।—আমার অন্তিমের সাধ পূর্ণ কর ;—একবার আনিয়া আমার কন্যাকে দেখাও, এই ভিক্ষা।"

আমিনা হাঁপাইয়া পড়িলেন ; মুখ দিয়া আবার একটু সফেন রক্ত নির্গত হইল।

"জগদীশ্বর! রক্ষা কর" বলিয়া, ঘিয়াস লম্ফ দিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে সেই চিহ্নিত স্থানে,—যে স্থানে আমিনার জীবনাধিক অমূল্যনিধি ইতিপূর্ব্বে বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন,—সেই মমতাপূর্ণ স্থানে—সেই সূর্য্যদগ্ধ অর্দ্ধমৃত মরুবৃক্ষের নিকট উপনীত হইলেন।

... তখন সেই অনন্তস্থান ব্যাপিয়া —ছায়াহীন, আশ্রয়হীন, বৃক্ষহীন, বিশাল বালুকাময় স্থান,—তখন অগ্নিবৃষ্ট হইয়া ধু-ধু জ্বলিতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঘিয়াস ত্বরিতপদে সেই কন্যা-পরিত্যক্ত চিহ্নিত-স্থানে উপনীত হইলেন। কিন্তু সহসা সম্মুখে এক বিষম বিভীষিকা দেখিয়া তিনি দুই চারি পা হটিয়া আসিলেন,—এবং ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া, নিশ্চল প্রস্তরবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। নীরবে সেই জীবন্ত অভিনয় হইতে লাগিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ঘিয়াস, মুহূর্ত্তকাল সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, এক ভীষণ অজাগর কালসর্প আপন করাল ফেনা বিস্তার করিয়া আমিনার জীবনাধিক কন্যারত্নের মস্তকোপরি অবস্থিতি করিতেছে। দেখিলেন,—সেই ভীষণ গোক্ষুরা

কুণ্ডলী পাকাইয়া, আপন বিচিত্র ভূষিত মস্তক উন্নত করিয়া, দেহভারে দুলিয়া দুলিতে ভীষণ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে ও এক এক-বার স্থিরভাবে শিশুকে নিরীক্ষণ করিতেছে! প্রকৃতির এই বিষম বৈষম্য সন্দর্শনে ঘিয়াস চমৎ-কৃত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন প্রখর আতপতাপ হইতে ছায়া দিবার জন্য, সেই সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সহচর, আপন স্বভাবসিদ্ধ হিংসা-বৃত্তি ভুলিয়া, স্থিরভাবে শিশুর শিয়রে বিরাজ করিতেছে। যেন জননীসমা স্নেহময়ী পালনকর্ত্রী ধাত্রী,—অসহায় শিশুকে স্তনপান করাইবার উদ্দেশে, স্নেহভরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে!

প্রস্তরমূর্ত্তির মত মুহূর্ত্তকাল স্থিরভাবে দাঁড়া-ইয়া ঘিয়াস এই অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিতে লাগি-লেন। দেখিতে দেখিতে দেখিতে, তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। একাধারে ভয়, বিস্ময়, আতঙ্ক এবং সঙ্গে সঙ্গে আশা ও উৎসাহ তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ আবির্ভূত হইতে লাগিল। সম্মুখে দ্বিতীয় মনুষ্য-মূর্ত্তি

দেখিয়া, সেই কাল-সর্প আপন করায়ত্ত শিকার পরিত্যাগ করিয়া, নিঃশব্দে সেই বৃক্ষের মূলদেশস্থ গহ্বরে চলিয়া গেল;—শিশুর জীবনের কোনরূপ অনিষ্ট করিল না।

এই অভাবনীয় ঘটনায়, ঘিয়াসের নিরাশা-মথিত হৃদয়ে এক অভাবনীয় আশার সঞ্চার হইল। প্রাকৃতিক নিয়মের এই আশ্চর্য্য উল্লঙ্ঘনে তিনি বুঝিলেন, শিশুর ভবিষ্যৎ-জীবন অভাবনীয় উজ্জ্বল হইবে! লোকপ্রবাদের নির্দেশানুসারে ইহাও বুঝিলেন,—বিজন মরুভূমে পরিত্যক্তা, এই অসহায়া শিশুকন্যা, কালে রাজ-রাজেশ্বরী হইবে! প্রকৃতি বহু পূর্ব্বে, নীরবে সেই ইঙ্গিত করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল ছবির বিমল সৌন্দর্য্য-ভোগ,—বর্ত্তমানে ঘিয়াসের ভাগ্যে অধিকক্ষণ ঘটিল না। কারণ তাঁহার বর্ত্তমান, গাঢ় অন্ধকারে আবৃত; সুদূর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভাবিয়া তিনি বর্ত্তমানের নির্ম্মম কঠিন হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। অদৃষ্ট-জয় অদৃষ্টাধীন জীবের সাধ্যের অতীত। হায়, অদূরে তাঁহার

জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী হৃদয়ের তীব্র উত্তাপে ঝলসিত হইয়া অন্তিমের শেষনিশ্বাস নিতেছে!

ঘিয়াস আশায় ও নিরাশায় তুল্যরূপে উদ্বেলিত হইয়া, কম্পিত হৃদয়ে সেই পরিত্যক্তা শিশু-কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং দ্রুতপদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মুমূর্ষু সহধর্ম্মিণীর নিকট পঁহুছিলেন।

অভাগিনী আমিনা তখন আপন ছায়ারূপিণী ... দেখিবার জন্য অতি কষ্টে জীবনের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন এবং গভীর অনুরাগভরে প্রতিক্ষণে স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে করিতে, এক একবার সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া নীরবে, ক্ষীণ নিশ্বাসে, মৃত্যুর নিকট পরাভব স্বীকার করিতেছিলেন।

সেই বিষম সমস্যাপূর্ণ সময়ে ঘিয়াস কম্পিত হৃদয়ে, শিশুকন্যাকে বক্ষে লইয়া, সেই স্থানে উপনীত হইলেন। কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন "প্রিয়তমে, জীবনাধিকে!"

আমিনা চক্ষু উন্মীলিত করিলেন; উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না,—মুখ দিয়া

আর এক ঝলক রক্ত বহির্গত হইল ; তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইলেন।

"জগদীশ্বর, এ কি দেখি !"—চীৎকার করিয়া ঘিয়াস কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমিনা, প্রাণাধিকে ! সত্যই কি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ? অভি-মানিনি, এই দেখ, তোমার প্রাণপুত্তলি—ভাবী রাজ-রাজেশ্বরীকে লইয়া আসিয়াছি ;—ইহাকে গ্রহণ কর। আর তুমি অভাগিনী নও ;—সতি ! সত্যই তুমি পরম ভাগ্যবতী; একদিন ইহ-লোকে তুমি 'রত্নগর্ভা' নামে অভিহিত হইবে।—জগদীশ্বর, রক্ষা কর !"

মুহূর্ত্তের জন্য আমিনার চৈতন্য আসিল। সেই অবসরে ঘিয়াস সংক্ষেপে পরিত্যক্তা শিশু-কন্যার অলৌকিক শুভ লক্ষণের কথা,—তাহার মস্তকে কাল-সর্পের 'রাজছত্র' ধারণের কথা বিবৃত করিলেন।

ক্ষীণ দীপালোক সহসা উজ্জ্বল হইল। মুমূর্ষু আমিনার ম্লানমুখে হাসিরেখা দেখা দিল। জ্যোতিঃহীন বিশুষ্ক নয়নকোণে জল আসিল।

মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সজীব হইলেন। তবে অত্যধিক দুর্ব্বলতাবশত উঠিয়া বসিতে পারিলেন না ;—শায়িতাবস্থায় কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং গভীর অনুরাগভরে ঘন ঘন তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়! মুহূর্ত্তের চৈতন্য, মুহূর্ত্তেই বিলুপ্তপ্রায় হইল। মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে, স্বামী ও কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার যে অভাবনীয় হর্ষ এবং তারপর উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করায় যে শ্রম,—অধিকন্তু কন্যাকে বক্ষে ধারণ করায় যে ক্লান্তি, তাহাতে তিনি অতি শীঘ্রই অবসন্ন ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমেই নিস্তেজ ও স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। ঘিয়াস বুঝিলেন, আমিনার অন্তিমকাল উপস্থিত।

তখন তিনি প্রাণঘাতিনী তীব্র যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"হায়, স্বার্থময় নিষ্ঠুর পৃথিবি!—ওহো মন্দমতি আত্মীয়স্বজন! এখন একবার আসিয়া দেখিয়া যাও,—তোমাদেরই অত্যাচারে, আজ এই বিজন মরুভূমে, আমার জীবনাবলম্বন,—আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছে!

ওঃ হিংস্রক, পরপীড়ক সমা... মুখচুম্বন ...ড়িবার
কি দুর্দ্দশা ও কঠোরতার মাঝে ...ন আলিঙ্গনে
ইহলোকের চরম সুখ,—জীবনের সা... অপূর্ব্ব
হারাইতেছি!—আমিনা, প্রাণাধিকে, সতি!

মর্ম্মাহত ঘিয়াস কাঁদিতে কাঁদিতে সেই সব আত্মীয় স্বজনকে,—যাহারা তাঁহার এই অভাবনীয় দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছিল,—তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন।

অন্তিম নিশ্বাস টানিতে টানিতে আমিনা ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর! আর ও-কথা তুলিয়া ফল নাই। আমি আমার অদৃষ্ট-ফল ভোগ করিলাম মাত্র।—নাথ, এই মাতৃহারা শিশুটিকে দেখিও। ইহাকে তোমার চরণে রাখিয়া যে আমি মরিতে পারিলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।"

আমিনা কি ইঙ্গিত করিলেন; শোকসন্তপ্ত ঘিয়াস গভীর অনুরাগভরে তাঁহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গেলেন। ক্ষীণ দীপালোক আর একবার হাসিয়া উঠিল। স্বামীর অধরে অধর মিলাইয়া আমিনা ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,

মুহূর্ত্তের জন্য তিনি স্মনতি রাখিও।—এই বিজন ধিক দুর্ব্বলতাকে সমাধিস্থ করিও;—যেন পশু-না;—আমার দেহের সৎকার না করে। আমার জন্য শোক করিও না। আমার কালপূর্ণ হইয়াছে, আমি চলিলাম। আমার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য এই শিশুটিকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম। কন্যা রাজ্যেশ্বরী হউক আর ভিখারিণী হউক, ইহাকে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে আমায় স্মরণ করিও। প্রাণেশ্বর! পরলোকে আবার আমরা মিলিত হইব। সেই পুণ্যলোকে আমাদের পবিত্র-প্রণয়ে আর কেহ বাদ সাধিতে পারিবে না। আমি সত্যই সৌভাগ্যবতী যে, একদিনের জন্যও তোমার ভালবাসায় বঞ্চিত হই নাই।—স্বামিন্! আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার আত্মার সদ্গতি হয়।"

নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া তদ্গতচিত্তে বিয়াস আমিনার এই মর্ম্মভেদী কথা গুলি শুনিলেন। নির্নিমেষ নয়নে সহধর্ম্মিণীর সেই ক্ষীণ মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অপাঙ্গ বহিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। গভীর

অনুরাগভরে তিনি সহধর্ম্মিণীর মুখচুম্বন করিবার তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। সে আলিঙ্গনে ও মুখচুম্বনে মুমূর্ষু আমিনার মুখে অতি অপূর্ব্ব হাস্য-রেখা বিকশিত হইল। সেই হাস্য—সেই মাধুরিমা স্থির থাকিতে থাকিতে, সতী নীরবে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

অদৃষ্ট অন্ধকার; কর্ম্মফল দীপ্যমান।—হায়, আমিনার ইহজন্মের সেই কর্ম্মফল ফুরাইল!

আর যিয়াসের? তাঁহার অদৃষ্টচক্র আর এক দিকে ঘুরিল। সেই ঘূর্ণনে যে ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা আপাততঃ তাঁহার বোধের অগম্য। প্রখর দিবালোকে,—সেই জ্বলন্ত সূর্য্যরশ্মিতেও তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। এবং এইরূপ অন্ধকার দেখিতে দেখিতে চেতনা হারাইলেন। শিশু-কন্যাটি মৃত জননীর পার্শ্বে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত রহিল। কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, এই জনশূন্য বিশাল প্রান্তরে, প্রকৃতি নীরবে কি মর্ম্মভেদী অভিনয় করিতে লাগিল!

নবম পরিচ্ছেদ।

অল্পক্ষণ পরেই ঘিয়াসের চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিলেন; কষ্টে উঠিয়া বসিলেন। পার্শ্বে কনকলতিকা বনিতার মৃতদেহ দেখিলেন। সকল স্মৃতি পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিল;—প্রাণে সহস্র বৃশ্চিক-দংশন প্রদান করিল। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ঘিয়াস কহিলেন,

"হায় মৃত্যু! তুমি একের প্রতি সদয় হইয়া অন্যের প্রতি নির্দ্দয় হইলে? এক সহযাত্রী আমরা,—জীবনের অর্দ্ধাংশ তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে লইয়া অপর অর্দ্ধাংশ এই কঠিন মাটীর পৃথিবীর উত্তাপ ভোগ করিতে রাখিয়া দিলে? হায় জাগরণ!—তুমি প্রত্যক্ষ দুঃস্বপ্ন; নিদ্রাই দুঃখীর একমাত্র সুখ;—মৃত্যুই দুঃখীর বন্ধু! কেন

আমার চৈতন্যোদয় হইল? আজীবন পুড়িবার জন্যই কি আমি জাগিলাম?—হায় অভাগিনী আমিনা!—মৃত্যুতেও তুমি কি সুন্দর! এই সুন্দর রূপকে সমাধিস্থ করিতে হইবে!—বিধাতঃ! মানুষকে তুমি কি কঠিন উপাদানেই নির্ম্মিত করিয়াছ!—দু'দণ্ড পরেই আবার সব ভুলিয়া যাইতে হইবে!—হায় রে বিস্মৃতি!”

ঘিয়াসের চক্ষে আর জল নাই। শোকদুঃখের অতীত অবস্থায় এখন তাঁহাকে অবস্থিতি করিতে হইতেছে। সম্মুখে কঠোর কার্য্যক্ষেত্র,—গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁহার অবশিষ্ট। শিশুকন্যাটি নিদ্রাভিভূতা; ক্ষণপরেই জাগরিত হইবে। তাহাকে ত রক্ষা করা চাই। ঘিয়াস মনে মনে কহিলেন,

“ওহো! আমিনার ঐ জীবন্ত ছায়া,—ঐ মায়ার পুত্তলি,—আমাকে কঠিন কর্ত্তব্য-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল! দেখিতেছি, উহাকে লইয়া এই ভাঙ্গাবুকে আমাকে আবার জীবন-যুদ্ধে যুঝিতে হইবে!—হায় মন্দভাগ্য শিশু! তোমার ভবিষ্যৎ যাহা হোক্,—বর্ত্তমানে,—পৃথিবীতে আসিয়াই কি অপার্থিব অমূল্যনিধি তুমি হারাইলে!

.ক কিরূপে রক্ষা করি? না,
. অন্তিম অনুরোধ,—জীবন দিয়াও আমায়
.করতে হইবে। কিন্তু জীবন ত তুচ্ছ; জীবন
দিলেও কি এই শিশুর রক্ষা হয়?"

এই সময় শিশুটি জাগিয়া উঠিল। স্তনপান করিবার জন্য, সংস্কার বশে, জননী-ক্রোড় অন্বেষণ করিল। সেই নীরব অন্বেষণ ও যত্ন নিষ্ফল হইল দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শিশুর কণ্ঠ শুষ্ক হইল। হায়, মাতৃ-স্তনদুগ্ধ ত সে, ইহ জন্মে আর পাইবে না! অপিচ গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ বা একটু-খানি জলও তাহার ভাগ্যে মিলিল না। [.মন কি. সময়গুণে নিকটে বা আশেপাশে একটি 'পান্থপাদপ' বৃক্ষও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ঘিয়ান বুঝিলেন, না, মনে করিলেই তিনি মরিতে পারেন না;—মৃত্যু সত্য সত্যই সৌভাগ্য সাপেক্ষ।

নিরুপায় ঘিয়ান তখন নীরবে আকাশপানে চাহিলেন। জ্বলন্ত সূর্য্যরশ্মি মুখ ঝলসিয়া দিল. তথাপি তিনি একদৃষ্টে আকাশ পানে চাহি[য়া]

রহিলেন। কিন্তু কৈ, তাঁহার সেই নীরব প্রার্থনায় ত বিধাতার দয়া হইল না?

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ঘিয়াস মুখ অবনত করিলেন। হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া কয় ফোঁটা গরম রক্ত পড়িল। এক বুদ্ধি আসিল,—ঘিয়াস সেইমত কার্য্য করিলেন।

দেখিলেন, তাহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। গাত্রে যে একটি মলিন জামা ছিল, সেটি খুলিয়া ফেলিলেন। জামাটি ছিঁড়িলেন। ছিঁড়িয়া একটি বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিলেন। সেই বর্ত্তিকা আপন কপোলে বুলাইয়া স্বেদসিক্ত করিলেন। কপোলদেশ হইতে অশ্রান্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। সেই ঘর্ম্মে বর্ত্তিকাটি আর্দ্র করিয়া,—আমিনার প্রাণপুত্তলির কোমল মুখে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। স্তন্যপায়ী অবোধ শিশু তাহাই ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল;—তাহাতেই অমৃতধার মাতৃস্তনাস্বাদ মিটাইল।—নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অলক্ষ্যে থাকিয়া এই নির্ম্মম দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

এদিকে সেই সহিষ্ণুতার অবতার ঘিয়াসের কষ্ট এক্ষণে অসহ্য হইল। উদর্য্যুপরি তিনদিনের

অনশনে এবং প্রাণঘাতিনী পিপাসায়, তিনি সেই উত্তপ্ত মরু-প্রান্তরে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। একে প্রাণাধিকা প্রিয়তমার শোচনীয় মৃত্যুশোক, তদুপরি দুর্ব্বিসহ ক্ষুৎপিপাসা ও এই ভীষণ দৈহিক যন্ত্রণা;—তাঁহার সর্ব্বশরীর দাহ হইতে লাগিল। অন্তরের মর্ম্মদাহ দেহের এই বহির্দাহে মিশিয়া, তাঁহাকে অধীর, অস্থির, উন্মত্ত করিয়া তুলিল। সেই মধ্যাহ্ন রবিকর-ঝলসিত উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে কিছুক্ষণ তিনি অরুন্তুদ যন্ত্রণায় দৌড়িয়া বেড়াইলেন; এক একবার বিকল-দেহে শুইয়া পড়িতে লাগিলেন। কখন বা সেই উত্তপ্ত বালুকাতে মুখ গুঁজিয়া সঘন নিশ্বাস টানিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শিশুকন্যাটি পিতৃদত্ত সেই স্বেদ-বারি পান করিয়া,—মায়ের মৃতদেহ-পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার মস্তকোপরি সেই তাম্বুরূপী ছত্রটি পূর্ব্ববৎ আচ্ছাদিত রহিল।

ঘিয়া... ...ণ যখন যায়-যায় হইল, তখন একটা বৃহৎ মরুপক্ষী একটা বন্যফল মুখে লইয়া সেইখান দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। দৈবক্রমে

সেই ফলটি তাহার মুখ হইতে খসিয়া পড়িল! বিধাতার দান ভাবিয়া ঘিয়াস তন্মুহূর্ত্তেই সেই ফলটি ভক্ষণ করিলেন। কিন্তু হায়, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে এক গণ্ডুষ জলে কি হইবে?—তাঁহার জঠরাগ্নি অতি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পুনরায় উন্মত্তবৎ সেই উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

এইরূপ কঠোর যন্ত্রণা ও অন্তর্দাহে সহসা তাঁহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল এবং তাহার অগ্রভাগ স্ফীত হইয়া উঠিল। জিহ্বা এতটা ফুলিয়া উঠিল যে, তাহা আর ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারিল না। অধিকন্তু, এই সময় তাঁহার মুখমণ্ডলে বড় বড় ব্রণ তুল্য স্ফোটক প্রকটিত হইল। এই-বার ঘিয়াস অতি কষ্টে সেই অনাবৃত স্থান হইতে উঠিয়া মৃতপত্নীর শয্যোপরি আশ্রয় লইলেন। তথা হইতে সম্পূর্ণরূপে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন এবং প্রতিক্ষণেই নিঃশব্দে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইল। সহসা তাঁহার সেই স্ফীত—বহিরাগত জিহ্বাটি ফাটিয়া

গেল। এবং তাহা হইতে খুব খানিকটা রক্ত-নির্গত হইল। এইরূপ, তৎ পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার মুখের সেই সদ্যোৎপন্ন স্ফোটক গুলিও ফাটিয়া গেল এবং তাহা হইতেও রক্তনির্গত হইল। এই স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ঘিয়াস এ যাত্রা প্রাণে রক্ষা পাইলেন। তাঁহার শরীর যেন অনেকটা সুস্থ হইল; দাহও অনেকটা কমিয়া আসিল। অচিরাৎ তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মাতৃহারা শিশুটিও নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

এক পার্শ্বে বনিতার মৃতদেহ; এবং অপর পার্শ্বে নিদ্রাভিভূত স্বামী ও শিশুকন্যা। সেই বিজন প্রান্তরে আর কেহ কোথাও নাই। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সেই অনন্ত স্থান পূর্ণ করিয়া, মনের সাধে অনল-বৃষ্টি করিতেছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

গভীর নিদ্রায় ঘিয়াসের জীবন-উত্তাপ নির্ব্বাপিত হইল। নিদ্রার মোহিনী শক্তিতে ঘিয়াস বিস্মৃতিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেন। সেই বিস্মৃতি ঘিয়াসের প্রাণে শান্তির হিল্লোল বহিয়া আনিয়া দিল।

বিস্মৃতি যে সর্ব্বপ্রকারে আসিল, তা নয়। এমন অবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে বিস্মৃতি আসে না। স্মৃতির যে স্নিগ্ধ অনুভূতি,—শান্তির যে একরূপ সুধাস্পর্শ,—অতীতের যে একরূপ কোমল করুণ-নীরব গীতি,—তন্দ্রা ও স্বপ্নের যে একরূপ মধুর মাদকতা,—তাহাতে করিয়া ঘিয়াস এখন যেন এক নূতন মানুষ হইলেন।

যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখিলেন, নৈশকাল উপস্থিত। সেই অসীম অনন্তপ্রান্তর

অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। নৈশপ্রকৃতি যেন একখানি ঘোর কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়াছে।

ঘিয়াস আকাশপানে চাহিলেন। দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রমালা নীরবে পৃথিবীপানে চাহিয়া আছে এবং চন্দ্রের বিমল স্নিগ্ধ রশ্মিতে জগৎ সুশীতল হইয়াছে। দেখিলেন, মৃদুমধুর বায়ু সঞ্চালনে প্রকৃতি হাস্যময়ী হইয়াছে। মরুভূমির সে উত্তাপ,—সে প্রচণ্ডতা,—সে ভীষণ অগ্নিমূর্ত্তি এখন আর নাই।

অবসাদের একটি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া, ঘিয়াস শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। সর্ব্বাগ্রে শিশু-কন্যাটির গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, কাহার অযাচিত কৃপায় শিশুটি এখনও বাঁচিয়া আছে এবং সমভাবে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। অথবা, তাঁহার নিজের নিদ্রাকালে শিশুর ঘুম হয়ত ভাঙ্গিয়া থাকিবে এবং তারপর হয়ত সে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া আবার আপনা আপনি ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে। যাই হোক, ঘিয়াস এখন অনেকটা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ। কৃতজ্ঞ অন্তরে তিনি ভগবানকে স্মরণ করিলেন এবং শিশুর

গাত্রোপরি একখানি বস্ত্র আবৃত করিয়া দিলেন।—শিশু সেই একভাবেই ঘুমাইতে লাগিল।

এখন, ঘিয়াসের এক গুরুতর কর্ত্তব্য মনে পড়িল। পতিপ্রাণা আমিনার সেই অনুনয়—"স্বামিন্! আমার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিও,—যেন পশুপক্ষীতে এ দেহের সৎকার না করে",—সতীর সেই অন্তিম-প্রার্থনা স্মরণ হইল। ঘিয়াস ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলেন। সেই ভারপূর্ণ মোট হইতে ধীরে ধীরে একখানি অস্ত্র বাহির করিলেন। এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখবর্ত্তী এক স্থানে একটি গহ্বর খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই কার্য্যে তিন চারি দণ্ড কাল অতীত হইল। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে। সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ, স্থির ও গম্ভীর। নিদ্রার শান্তিক্রোড়ে চরাচর বিশ্ব অবস্থিত। আকাশের চাঁদ আপন মনে হাসিতে হাসিতে ভাসিতে ভাসিতে আপন স্থানে যাইতেছে। চাঁদের হাসি ত নিদ্রালীন প্রকৃতিও হাস্যময়ী। কেবল হায়, ঘিয়াসের বুকের ভিতর মর্ম্ম-কাতরতা!

ঘিয়াস একবার উদাসপ্রাণে আকাশপানে চাহিলেন। কাহার উদ্দেশে নীরবে কি জানাইলেন। ফোঁটাকত তপ্ত জল চক্ষু দিয়া পড়িল।—হায়! এত রাত্রে,—এই শীতলতায়ও চোকের জল উষ্ণ থাকে?

তারপর ঘিয়াস মমতাপূর্ণ নয়নে মৃত সহধর্ম্মিণীর পানে চাহিলেন। চাঁদের কিরণ সেই মৃতার চাঁদমুখে পতিত হওয়ায় ঘিয়াস বুঝিলেন, যেন তাঁহার প্রিয়তমা সুস্মিত মুখে ি া যাইতেছেন। মনে বুঝি ভাল বিশ্বাস হইল না,—ঘিয়াস সম্পূর্ণরূপে পত্নীর মুখাবরণ উন্মোচিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এবার সে চাঁদমুখে সম্পূর্ণরূপে চাঁদের ছায়া পড়িল। তখন ঘিয়াস একবার সেই জীবন্ত চাঁদ, আর বার সেই মৃত চাঁদ দেখিতে লাগিলেন। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাহা দেখিলেন। এবারও হায়, তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিল,—"যখন এই দুই চাঁদ এক হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই প্রিয়তমা আমা‍ ঘুমঘোরে অচেতন!—হায় রে! এমনই কত নিশি উন্মুক্ত গবাক্ষ-দ্বারে প্রিয়ার আমার এই প্রেমময়ী মূর্ত্তি

দেখিতে দেখিতে জীবনের কত উত্তাপ বিস্মৃত হইয়াছি !—সেই চাঁদ, সেই নিশি, সেই প্রিয়া, সেই আমি ;—আজ কি প্রকৃতি আমার প্রতি বাম হইবে ?”

কি ভাবিয়া ঘিয়াস বনিতার নাসিকায় হস্তার্পণ করিলেন ; বক্ষঃস্থলে—পঞ্জরের দিকেও একবার হাত দিয়া দেখিলেন ; কিন্তু কৈ, একটি নিশ্বাস, বিন্দুমাত্র উত্তাপও ত পাইলেন না ?— “জগদীশ্বর ! এতটা কষ্টও কি তোমায় দিতে হয় ? ভাল, একবারে জীবন না দাও,—এক মুহূর্ত্তের জন্য একটি নিশ্বাস দাও, একটিমাত্র স্পন্দন দাও,—একবার মাত্র মুখে সেই মৃত-সঞ্জীবনী সুধা দাও ;—ইহজন্মের মত আমি আর একবার— একটিবার মাত্র অধরে অধর মিলাইব ;—আমার শতজন্মের সাধ পূর্ণ করিব !—কৈ, এ ত সেই সমান শীতলতা, সেই সমান জড়তা,—সেই একরূপই——কেও ? ও কিসের শব্দ ? এ নিশীথে, এ বিজনে, ও শব্দ কার ?—হে অনন্ত শব্দময়ী পৃথিবি ! তোমার বুকে কত শব্দ আছে মা,— তোমার কি এমন শক্তি নাই যে, প্রিয়ার আমার মুখ

হইতে একটি শব্দ বাহির হয়? আমি একবার মাত্র ঐ মুখের একটি সম্বোধন শুনিব; তার পর যেমন মাটীর দেহ,—তোমার ঐ অনন্ত মাটীতেই মিশাইয়া রাখিব!"

কিন্তু কৈ, পৃথিবী ত কোন উত্তর দিল না? নীরব, নির্জ্জন, গম্ভীর প্রান্তর,—সেই একভাবেই নীরব নির্জ্জন ও গম্ভীর রহিল। কেবল অশ্রান্ত একতানপূর্ণ ঝিল্লীরব সেই গাম্ভীর্য্যকে অধিকতর গম্ভীর করিয়া রাখিল। আর মাথার উপর সেই আকাশের জীবন্ত চাঁদ হাসিতে হাসিতে সম ভাবেই কিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল।—কিন্তু কৈ, কিছুরই ত কোন শব্দ হইল না?

ঘিয়াস পশ্চাতে চাহিলেন, দে[illegible]লন, একটা শৃগাল শিকার অন্বেষণ করিতে করি[illegible] সেখান দিয়া যাইতেছে। তখন তাঁহার চমক [illegible]িল। বুঝিলেন, উন্মত্তের ন্যায় এতক্ষণ বৃথা [illegible]লাপ করিতেছিলেন,—মরা-মানুষ কি কখন [illegible]রিয়া আইসে?

অদূরে কি একটা আলোক দৃষ্ট হইল। আলোকটা থাকিয়া থাকিয়া নিবিয়া যাইতেছে, আবার

পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। ’ব শিশু-দেহ কণ্টকিত হইল। তিনি মনে মনে বলি...গ "না আর বিলম্ব নয়। এ বিজন প্রান্তরে এমন অনেকরূপ বিভীষিকা আছে! ও কি আলেয়ার আলো,—না কোন্ জীবের মুখ দিয়া উহা বাহির হইতেছে? এ নিশীথে, এ বিজনে এমন আরও কত বিভীষিকা দেখিতে পাইব!—শিশুকন্যাটি নিদ্রিত, যদি এখন জাগরিত হয়, তবে আবার ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। অতএব, প্রিয়ার শেষ-কার্য্য সমাধান করি। আর বিলম্ব করা, কোন-মতে যুক্তিযুক্ত নয়।"

ঘিয়াস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুই হস্তে ক্ষীণ-কলেবরা আমিনার মৃতদেহ ধারণ করিলেন। আবার বক্ষঃ কম্পিত হইল। অতীতের অনেক স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ঘিয়াস কেবলমাত্র খুব জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। এবং তারপর বুকে একটু বল আনিবার জন্য, কি একটু সাহস অথবা বিস্মৃতি আয়ত্ত করিবার মান , তিনি ইচ্ছা করিয়া একবার গলাটা সাড়া দিলেন। হায়, এ বিজন প্রান্তরে এমন আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই

হইতে একটি ...র সেই ভাঙ্গা গলা-সাড়ার প্রতিও এ... কটু
মাত্র ঔ...নুভূতি প্রকাশ করে! ...ান।

ঘিয়াস, পত্নীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়ে...রয়া, এবং তদুপরি একটি বালুকাস্তূপ ...স্তুত ক...জও শয্যা ও তাম্বু সমেৎ শিশুকন্যাকে ... নিয়া নি...হি-তাহার উপর শায়িত হইলেন। ম...মনে... পূর্ণ লেন, "আমিনা, তোমার অস্তিমে প্রার্থনা...ার করিলাম। মরণান্তে তোমার সমা...হইল। আমার ভাগ্যে,—হায়! যতদিন এ সংসারে থাকিব,—আমার ভাগ্যে জীয়ন্তে সমাধি হইল!—হে অন্তরাত্মা! আর, উপরে যদি কেহ থাক,—সকাতরে বলি,—দীনের প্রতি প্রসন্ন হও; আ... সতীসাধ্বী আমিনার আত্মার সদ্গতি করিও।"

আপন মনে এইরূপ বিলাপ ও প্রার্থনা করিতে করিতে; গভীর অবসাদে, ঘিয়াস শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আর সেই সর্ব্বদর্শী সর্ব্বসাক্ষী, অলক্ষ্যে থাকিয়া, তাঁহাদের পাহারা দিতে জাগিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রভাতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, ঘিয়াস দেখিলেন, কতকগুলি অপরিচিত বিদেশী লোক

তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহার শিশু-কন্যাকে ছাগ-দুগ্ধ পান করাইতেছে।—ছাগ তাঁহাদের সঙ্গেই ছিল।

এই অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে ঘিয়াস চমৎকৃত হইলেন। একবার ভাবিলেন, "এও একরূপ মায়া নাকি? সেই হ্রদদর্শনের ন্যায়, এও ত এক রকম প্রহেলিকা নয়?" পরক্ষণে বুঝিলেন, "না, সত্যই ইহাঁরা ঈশ্বর-প্রেরিত দয়ার্দ্রচিত্ত মনুষ্য-মণ্ডলী। বুঝিলাম, এই শিশুকন্যার শুভ প্রারব্ধ, কোন্ মোহিনী শক্তিতে, ইহাঁদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে?"

ঘিয়াস যেন কোন নূতন জগতে আসিলেন। তাঁহার বিস্ময় ও বিহ্বলতার আর সীমা রহিল না।

এই পথিকগণ ভিন্নদেশীয় বণিক; বাণিজ্যার্থ লাহোর যাইতেছিলেন। মরুভূমি পারের যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। পথে অর্দ্ধোন্মুক্ত এক অসম্পূর্ণ তাম্বুমধ্যে এই নিঃসহায় পথিক ও শিশুকন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের দয়া হইল। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে জাগ্রৎ শিশুটিকে দুগ্ধ পান করাইলেন। তৎপরে শিশুপিতা জাগ্রৎ

হইবামাত্র তাঁহাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল দিলেন।

ঘিয়াস বিধাতার প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ সম্মুখে এই দয়ার্দ্রচিত্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে দেখিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে কহিলেন, "কে আপনারা,—এ দীনকে এ বিজনে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন?" দলস্থ বয়োঃজ্যেষ্ঠ এক প্রবীণ ব্যক্তি কহিলেন, "মহাশয়, কৃতজ্ঞতা দেখাইবার ও পরিচয় লইবার সময় যথেষ্ট আছে,—অগ্রে আপনি পানাহার করিয়া প্রাণরক্ষা করুন।"

ঘিয়াসও তাহাই করিলেন। পানাহারে, সত্যই তাঁহার নিৰ্জ্জীব দেহে প্রাণ আসিল। সেই দয়ার্দ্র লোকমণ্ডলীর সহিত কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিয়া, আপন দুঃখময় জীবনকাহিনী তাঁহাদিগকে শুনাইয়া, তাঁহাদের সাহায্যে শিশুকন্যাকে লইয়া, সেই দিনই তিনি নির্ব্বিঘ্নে লাহোর পঁহুছিলেন।

হায়, বুঝি কেবল এই বিজন মরুভূমে আমিনা-প্রতিমা বিসর্জ্জিতা ও এই অলৌকিক জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা ভূমিষ্ট হইবে বলিয়াই বিধাতা তাঁহাকে এই কঠোর পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন! যাঁহার

খেলা তিনি সাঙ্গ করিলেন, ওদিকে অদৃষ্টেরও জয় ঘোষিত হইল। কিন্তু সেই অন্ধকারে, নীলআকাশ-তলে, বিজন মরুভূমে ঘিয়াস যে প্রাণময়ী স্মৃতি রাখিয়া গেলেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সেই প্রেমময়ী মনোমুগ্ধকরী মূর্ত্তি অহর্নিশ তাঁহার অন্তরের অন্তরে জাগরূক রহিয়া গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

আশা—আলোক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট অনুকূল হইল। অন্ধকারে আলোক দেখা দিল। ঘিয়াস, ভারত-সম্রাট আকবরের শরণাপন্ন হইলেন। গুণগ্রাহী আকবর ঘিয়াসকে আশ্রয় দিলেন। ঘিয়াসের সকল দুঃখের অবসান হইল। বিদ্যামত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকারিতাগুণে এবং সর্ব্বোপরি মহৎ চরিত্র প্রভাবে, ঘিয়াস অল্পদিনেই সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।—ক্রমে তিনি ভারতসাম্রাজ্যের কোষাধ্যক্ষের উচ্চপদ লাভ করিলেন।

সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, ঘিয়াস বেগ সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সম্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শক্তি এবং অধিকার অপ্রতিহত হইল। স্বয়ং ভারত-সম্রাট, তাঁহার মহত্ত্ব ও

মনস্বিতায় মুগ্ধ হইলেন।—পাঠক, এখন একবার সেই ভীষণ মরুভূমিস্থ সেই চরম দুর্ভাগ্য-সহচর পথিককে স্মরণ করুন!

ঘিয়াসের এই সৌভাগ্যসূত্র আর একটি প্রাণীর সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইয়া ছিল। সে প্রাণী,—সেই ঘোর অসহায় অবস্থায় বিজন মরুভূমে জন্মগ্রহণকারিণী, পরিত্যক্তা এবং তৎ-পরে পুনর্গৃহীতা,—তাঁহার সেই নয়নানন্দরূপিণী দুহিতা। বস্তুতঃ, এই অসামান্য লোকললামভূত কন্যারত্নের ভুবনমোহন রূপে ও অতুলনীয় গুণ-গ্রামে, ঘিয়াসের ভাগ্যলক্ষ্মী অচলা ও সুপ্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিল।

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী ও অনুপমা লাবণ্যবতী বলিয়া,এই কন্যার নামকরণ হইয়াছিল,—মেহেরল্-নেসা। রূপ-প্রভায় যে রমণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়,—যাহার অলোকিক রূপ-জ্যোতিঃ চন্দ্রমাকে পরাস্ত করে, সেই সৌভাগ্যবতী রমণী এই উচ্চ আখ্যার অধিকারিণী হইয়া থাকে। মেহেরল্নেসা সত্যই রমণী-রত্ন। রূপে গুণে তিনি অতুলনীয়া। অল্পদিন মধ্যেই সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে তিনি বরণীয়া হইয়া

উঠিলেন। ঘিয়াসের সৌভাগ্য-সূত্র তাঁহার সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত হইল।

রূপের স্বরূপ কি, তাহা ঠিক জানি না। রূপ চক্ষেন্দ্রিয়ের অতীত, কি অন্তরেন্দ্রিয়ের অন্তর্ভূত, তাহাও বলিতে পারি না। রূপ চক্ষু দিয়া দর্শন করে, কি প্রাণ সে সুধা পান করে, তাহাও বলা কঠিন। রূপের স্থান এই স্থূল বাহ্য-জগতে, কি ভাবুকের মনোরাজ্যে, তাহাও নির্ণয় করিতে পারি না। এ প্রতিমা চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া অনিমেষ নয়নে দেখিতে হয়, কি হৃদয়াসনে এ প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে হয়, তাহাও বুঝিলাম না। লোকে ভাসা-কথায় যাহা বলে, তাহাই চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু হায়, রূপ! তোমার স্বরূপ কি, তাহা ত বুঝিলাম না! তোমায় চোকে দেখিয়া ত কেহ পরিতৃপ্ত হয় না? নয়নের যে পিপাসা, সে পিপাসা ত চিরদিনই অতৃপ্ত থাকিয়া যায়? তবে রূপ, তোমার স্বরূপ কি?—বলিয়া দাও, তুমি কি?—তুমি সাকার কি নিরাকার, বাস্তব কি কল্পনা, প্রত্যক্ষ কি অনুভূতি,—বলিয়া দাও, তুমি কি?

তোমার স্বরূপ, কেহ ত বুঝিতে পারিল না? তাই না সেই পরম প্রেমিক কবি অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়া বলিয়াছেন,—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

সত্য, জন্মাবধি তোমায় দেখিয়াও কেহ চক্ষের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না।—হায়, তুমি রূপ!

মেহেরন্নেসা এ হেন রূপের অধীশ্বরী—রূপের রাণী হইলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ-জ্যোতিঃ সমগ্র জগতের চক্ষু আকৃষ্ট করিল। ত্রৈলোক্যসুন্দরী সমা তিনি ভারতে পরিকীর্ত্তিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, লোকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তিনি ধন্য হইলেন।

সত্যই ঘিয়াস-দুহিতা অপূর্ব্ব সুন্দরী। যেখানে যেমনটি সাজে, সেখানে সেইরূপ সৌন্দর্য্য দিয়া, সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ দেখাইবার উদ্দেশ্যে, বিধাতা যেন নির্জ্জনে মনের সাধে এ জীবন্তপ্রতিমা গঠিত করিয়াছেন। বালিকার দেহে রূপ আর ধরে না। তপ্ত কাঞ্চনপ্রভ ঔজ্জ্বল্য ও চন্দ্রমা-কিরণ

সংস্ম.... স্নিগ্ধজ্যোতিঃ,—এ দু'য়ের মিশ্রণে যে বর্ণ ...পন্ন হয়, বালিকার দেহের বর্ণ সেই-রূপ ...তাহাতে কখন বা প্রখর সূর্য্যদীপ্তি প্রকাশ পায় ...কখন বা মধুর কৌমুদী রাশি প্রবাহিত হয়। ...ঘরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি;—কখন অবেণী সংবদ্ধ, কখন বা বেণীযুক্ত হইয়া ফণিণীর ন্যায় পৃষ্ঠে দুলিতে থাকে। আকর্ণবিস্তৃত নয়ন যুগল; সে বিশাল চক্ষু কখন স্থির, অচঞ্চল, কটাক্ষ-রহিত; কখন বা তাহা বিদ্যুদ্গতিতে চারিদিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ যুগ্ম-ভ্রূ; তিল-ফুল তুল্য সুগঠিত নাসা; বিকশিত গোলাপতুল্য গণ্ডস্থল; কম্বু কণ্ঠ; মরাল গ্রীবা; মুক্তাপাঁতির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তশ্রেণী; সুধার আধার সুকো-মল রক্তাভ সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠ,—স্বাভাবিক মৃদুহাস্যে তাহা ঈষৎ কম্পিত,—সুকুমার মুখ-চন্দ্রমা,—তদুপরি বিচিত্র গঠন-পারিপাট্য——যেন চিত্র-পটে চিত্র বিরাজিত।

বালিকার বয়স ষোড়শ উত্তীর্ণ হইয়াছে। যৌবনের লক্ষণ সকল দেহে উছলিয়া পড়িতেছে। অনুরাগোৎফুল্ল অধরে হাসি, হাস্য-প্রদীপ্ত নয়নে

অপূর্ব্বদ্যুতি, প্রেম-বিকশিত মুখে পবিত্রতা,—তিনে মিশিয়া সেই মোহিনী মূর্ত্তিকে মনোমোহিনী মাধুর্য্যময়ী করিয়াছে! সুগোল সুকোমল হেম-কান্তি বাহুযুগল, মেখলামণ্ডিত ক্ষীণ কটি তট, নবোদিত স্থির পয়োধর, নাতিস্থূল নাতিশীর্ণ সুগঠিত নিতম্ব, অলক্তরাগরঞ্জিত সিঞ্জিনীপরিহিত নর্ত্তনশীল চরণ,—সত্যই যেন চিত্রপটে চিত্র বিরাজ করিতেছে!)

সুন্দরী কখন মণিমাণিক্যে বিভূষিতা; কখন বা ফুল-অলঙ্কারে সুশোভিতা। কখন গজমতি হীরাপান্না-মণ্ডিত হার-বলয়-মুকুটে ও বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সূক্ষ্মবসনে সমলঙ্কৃতা; কখন বা আলুলায়িত কুন্তলে বিনা অলঙ্কারে একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধানে অবস্থিতা;—কিন্তু যে ভাবে হউক আর যে বেশেই হউক,—সে রূপ সদাই অনিন্দ্যসুন্দর ও অপূর্ব্ব। তুমি যোগী হও ভোগী হও, গৃহী হও সন্ন্যাসী হও, বালক হও বৃদ্ধ হও, স্ত্রী হও পুরুষ হও,—একবার তোমায় সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিপানে চাহিতেই হইবে। সে মূর্ত্তির ধ্যান তুমি কর আর নাই কর,—একবার

র্গত হইত যে,
সে মূর্ত্তিপানে তাকাইলে, তোমার মস্ত বসিয়া হইতে অবনত হইবে। রমণী সম্রাট-কন্যা ও দেবাঙ্গনা কিংবা অসীম ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী বলিয়া যে তাঁহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় তাহা নহে ;—কিন্তু যে সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া তিনি পৃথিবী হাস্যময়ী করেন, সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রভাবেই মস্তক অবনত হইয়া থাকে। ইহারই নাম সৌন্দর্য্যের প্রভাব!

ইহা ত গেল মেহেরের বাহ্য-সৌন্দর্য্যের কথা ; বালিকার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য বুঝি আরও মনোহর। হৃদয় পবিত্রতা, সরলতা ও দয়ার আধার ; সুতরাং সেখানেও পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। অন্তরে সৌন্দর্য্য না থাকিলে, বাহিরে এত শোভা হইবে কেন ? তাই সৌন্দর্য্য-স্রোতস্বতী যেন বালিকার হৃদয়ে বাহিরে সমানভাবে প্রবাহিত।

নৃত্য, গীত, বাদ্য, স্বরসংযোজন প্রভৃতি সমস্ত সঙ্গীতবিদ্যা ; চিত্র, কারুকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত শিল্পবিদ্যা ; কবিতা, শ্লোকপ্রণয়ন, লিপি-রচনা প্রভৃতি যাবতীয় কাব্য-বিদ্যা,—বালিকার আয়ত্তাধীন। সংস্কৃত ও পারসী ভাষা তিনি সুন্দর শিখিয়া-

এরূপ বিদূষী, বরাননী, বিম্বাধরী যে, ...লের মন প্রাণ আকর্ষণ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? বস্তুতঃ, মেহেরলন্নেসা অতি অল্প-কাল মধ্যেই দেশবিখ্যাতা ও নায়িকাপ্রধানা হইয়া পড়িলেন।

বালিকা বসিয়া থাকিত, যেন বোধ হইত, একটি অনুপম ভাস্করমূর্ত্তি বসিয়া আছে। বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইত, মনে হইত, যেন কে একখানি জীবন্ত প্রতিমা তথায় স্থাপিত করিয়া গেল। বালিকা চলিয়া যাইত, অনুমিত হইত, যেন লোকান্তর-আগত কোন গন্ধর্ব্ব-কন্যা ছায়ালোকে বিহার করিতেছে! এইরূপ, বালিকা কখন ঈষৎ চাঞ্চল্য সহকারে দৌড়িয়া গেলে মনে হইত, বুঝি কোন পরী পথ ভুলিয়া, অচিরে লোকলোচনের অদৃশ্য হইবে বলিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে।—বস্তুতঃ মেহেরলন্নেসা এমনই অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী।

স্বভাবতঃ বালিকার দেহ হইতে একরূপ স্নিগ্ধ পদ্মগন্ধ নির্গত হয়; তদুপরি নানাবিধ গন্ধ-দ্রব্যের সমাবেশে,—বালিকার সেই চন্দ্ররশ্মি-বিক-শিত তরঙ্গায়িত কমনীয় দেহে এমন এক মধুর

মনোমুগ্ধকর আবেশময় গন্ধ বিনির্গত হইত যে, বালিকার কাছে অধিকক্ষণ নির্ব্বিকারচিত্তে বসিয়া থাকা দায় হইত।—তবুও মেহেরল্‌নেসা এখনও অবিবাহিতা কুমারী কিশোরী ;—এখনও তাঁহার যৌবনের অর্দ্ধোদয় !

মেহের কথা কহিত, যেন বীণা বাজিত। মেহের হাসিত, যেন ভূতলে বিদ্যুৎ খেলিত। মেহের যদি কখন রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করিত, তবে সে রূপপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। আর, যদি কোন কারণে মেহেরের চক্ষে জল আসিত ; তখন মনে হইত,—আ মরি মরি ! মানবীদেহে এত রূপ, এমনই সৌন্দর্য্য-সুষমা ?—কোন্ বিধাতা এমন জীবন্ত রূপের প্রতিমা গড়িল রে ? ফল কথা, যে সুন্দর, তার সবই ভাল। মেহেরেরও সব ভাল। সকল অবস্থাতেই মেহেরকে সৌন্দর্য্যের সীমাবর্ত্তিনী—শোভারাণী বলিয়া বোধ হইত।

বালিকার প্রত্যেক অঙ্গই আপন আপন সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। তার পর সেই প্রত্যেক অঙ্গ যখন চালিত হয়, তখন তাহা হইতে এক

অভিনব সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া থাকে। আবার সেই সমস্ত চালিত-অঙ্গ যখন একটি পূর্ণ আকার ধারণ করে, তখন সে সৌন্দর্য্য-শোভা শতচক্ষে দেখিতে সাধ যায়।—দেখিতে দেখিতে চক্ষের পলক রহিয়া যায়,—মনে হয়, কৈ, আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া ত দেখা হইল না ?

এই দৈহিক সৌন্দর্য্যের সহিত আবার যখন হৃদয়-সৌন্দর্য্যের মিলন হয়, তখন সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানুষ সত্য সত্যই সে রূপের উপাসনা করে। মেহের যখন স্থিরভাবে পালঙ্কে বসিয়া আপন চম্পকদলনিন্দিত অঙ্গুলিস্পর্শে বীণাবাদন করিতে করিতে মধুরতম কণ্ঠে সপ্তস্বরের আলাপ করিতে থাকেন;—যখন সেই সুধাস্বর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে লীন হয়,—তখন মনে হয়, সৌন্দর্য্যের ইহাই শেষ ; স্বভাবের গতির এই চরম।—নর বা নারীদেহে ইহাপেক্ষা সৌন্দর্য্য বুঝি আর হয় না !

ইহার উপর আবার সঙ্গীতে, সাহিত্যে, চিত্রে ও কারুকার্য্যে,—মেহেরের সম্যক অধিকার। সুতরাং সহজেই অনুমিত হয়, এ নায়িকা কিরূপ

মনোমোহিনী! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেহেরের পিতার আয় এখন অজস্র;—সুতরাং কোন বিষয়ে মেহেরের শিক্ষার ত্রুটি রহিল না। তখনকার সময়ে লোকে যাহা কিছু চায়, মেহের সে সমস্ত বিষয়েই সুদক্ষা হইলেন।

সঙ্গীত ও সাহিত্য, এবং চিত্র ও কারুকার্য্যের জন্য মেহেরের পৃথক পৃথক শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। ঘিয়াস সর্ব্বান্তঃকরণে, বিশেষ অনুরাগের সহিত কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিতে লাগিলেন। এবং কন্যার ভোগবিলাস ও আমোদ প্রমোদের জন্য প্রচুর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মেহের এমনই ভোগসুখে প্রতিপালিত ও উচ্চ প্রকৃতিতে পরি-চালিত হইতে লাগিলেন যে, বাদসাহ-কন্যারাও সব সময় সেরূপ সুবিধা পাইতেন না। অন্ততঃ সব সত্বেও তাঁহাদের এমন সুবন্দোবস্ত ছিল না। ঘিয়াস সদাই ভাবিতেন,—

"এই আমার আমিনার শেষস্মৃতি। প্রিয়তমার ছায়ারূপিণী এই কন্যাকে বিশিমতে সুশিক্ষা দিব; সর্ব্বপ্রকারে তাহার মনকে বড় করিব। ভোগবিলাস, আমোদ আহ্লাদ,—এ বিষয়েও

উহার প্রবৃত্তিকে ছোট হইতে দিব না।—হায়! কত কাল অতীত হইয়াছে,—সেই বিজন স্থান,—আশ্রয়হীন সেই ভীষণ মরুভূমি, সেই অভাগিনী আমিনা,—সেই আমি,—সমস্তই যেন চক্ষের সমক্ষে ভাসিতেছে! তারপর এই কন্যা,—ইহাকে বিসর্জ্জন,—আমিনার অনুরোধে পুনঃগ্রহণ,—ইহার মস্তকোপরি কাল-সর্পের ফণা-বিস্তার,—আমিনার শোচনীয় মৃত্যু,—ওঃ! জগদীশ্বর! কত সহিষ্ণুতাই তুমি মানবপ্রাণে দিয়াছ!—সে দৃশ্য আমার অন্তরের অন্তরে চির মুদ্রাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে,—সমাধিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বিস্মৃত হইবার নয়!—হায় জাগরণ! এখন তুমিই সত্য হইলে? কোথায় আমার সেই জীবনাধিক অমৃতময় স্বপ্ন? ওহো, বুক যে সাহারা হইয়া গিয়াছে!—এ বুকে মন্দার-কুসুমতুল্য, তুমি চিরানন্দময়ী মা আমার! —মেহের, চিরসুখী হও। বৃদ্ধের শেষজীবনের একমাত্র আশা,—যেন মা তোমাকে সৎপাত্রস্থ করিয়া যাইতে পারি। যে বিধাতা তোমার দেহে এই অতুল্য রূপ দিয়াছেন, এবং যাহার জন্য তুমি রমণী-সমাজে এ উচ্চ সম্মান পাইয়াছ, মনে

হয়, তিনিই তোমার যোগ্যপাত্র মিলাইয়া দিবেন! তার পর?—থাক্, সে উচ্চতম আশা, মেহেরের অদৃষ্টে থাকে, হইবে।—কিন্তু হায়, এ সময় কোথা তুমি হৃদয়েশ্বরী? আজ এ আশাপূর্ণ হৃদয় কাহার বক্ষে রাখিয়া মর্ম্মকথা পরিব্যক্ত করি? থাকো, চিরমহোকরী স্মৃতি! তোমার অমৃত নিশ্বাসে বুকের অনেক উত্তাপ প্রশমিত করিতে পারিব।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন সন্ধ্যার পর আগ্রা নগরে, যমুনার তীরে বসিয়া, এক হিন্দুযুবক আপন মনে নৈশ-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতেছিলেন। ঈষৎ বায়ু-চাঞ্চল্যে স্থির যমুনা কেমন ধীরে ধীরে লহরী-মালা তুলিয়া যাইতেছে, যুবক তাহাই দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, অসীম অনন্ত আকাশ নক্ষত্রমালায় ভূষিত হইয়া, চন্দ্রমাকে বক্ষে লইয়া, শান্ত স্থির গম্ভীর হইয়া আছে; আর যমুনার নির্ম্মল শ্যাম সলিলে কেমন তাহার অবিকল প্রতিকৃতি প্রতিভাত হইয়াছে! দেখিতেছিলেন, সে প্রতিবিম্ব এক মুহূর্ত্তও স্থির নয়;—জলও কাঁপিতেছে, জলের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিবিম্বও কাঁপিতে কাঁপিতে, নাচিতে নাচিতে অতলে

ডুবিয়া যাইতেছে। পরক্ষণে কি মনে করিয়া তাহা আবার ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছে। যুবক একবার আকাশপানে চান, আর বার সেই ঈষচ্চঞ্চল নির্ম্মল জলরাশির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন;—দেখেন, আকাশ একভাবেই অবস্থিত আছে,—বালিকা যমুনা চাঞ্চল্যবশতঃ আকাশের সহিত এই লুকোচুরি খেলিতেছে।

যুবক নিবিষ্টমনে অনেকক্ষণ ধরিয়া নৈশ-প্রকৃতির এই মনোহর খেলা দেখিলেন। একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন,

"হায়, এ সংসারে খেলে ত সকলেই!—আপনার জন—ভালবাসার সাথীকে লইয়া খেলিতে, সকলেই ভালবাসে। ঐ উদার অনন্ত আকাশ কেমন আপনার সাথীগুলিকে লইয়া সাজিয়া আছে; আর বালিকা যমুনা এই এতদূরে থাকিয়াও কেমন হাসি-হাসি মুখে তাহাকে প্রেম-সম্ভাষণ করিতেছে! ভাবের যোগ না হইলে খেলায় সুখ নাই। কিন্তু চঞ্চল সংসার এ ভাব চায় না,—ভাব ভাঙ্গিয়া দেয়।"

যুবক আপন মনে মনে গুন্ গুন্ স্বরে গায়িলেন,—

"অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণী হীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভাঙ-বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥"

যুবক আপন মনে গায়িতে লাগিলেন, আর যমুনার অস্ফুট কুল কুল স্বর তাহার সহিত সুর দিয়া তালে তালে নাচিতে লাগিল। মাথার উপর চাঁদ হাসিতেছে, নক্ষত্র জ্বলিতেছে, চারিদিকে নীরবতা বিরাজ করিতেছে;—যুবক আপনা হারাইয়া আপন ভাবে বিভোর হইয়া এই প্রেম-গাথা গায়িতে লাগিলেন। গায়িতে গায়িতে হৃদয় উথলিয়া উঠিল। গানের প্রতি বর্ণ যেন অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। যেন প্রাণের ভিতর হইতে আর সকল চিন্তা তিরোহিত হইয়াছে, কেবল গানের সে সম্মোহন সুরে তিনি ভাসিতেছেন। যুবক গায়িলেন,—

"গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমোতি-হারা।

কাম কম্বু ভরি   কনয়া শম্ভুপরি,
চারত সুরধুনী ধারা।
পরসি প্রয়াগে   জাগ-শত জাগই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ   গোকুল নায়ক,
গোপীজন অনুরাগী॥"

গান গায়িতে গায়িতে যুবকের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কি স্মৃতি জাগিতেছিল;—তিনি দেখিলেন, অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়াছে। চক্ষু দুইটি পরিষ্কার করিয়া যুবক একবার আকাশ পানে চাহিলেন; নীরবে কাহাকে কি মর্ম্মকথা জানাইলেন। তার পর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, যমুনার কালো জলে লহরী-লীলা দেখিতে দেখিতে,—সেই আকাশপট-শোভিত অগণিত নক্ষত্রভূষিত নির্ম্মল চন্দ্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবাবেশে গায়িলেন,—

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে   তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দই গেল॥

আধ চাঁচর খসি আধ বদনে হসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ ॥”

সেই সুধা-স্বর ধীরে ধীরে উচ্চগ্রামে চড়িতে লাগিল ; বায়ুহিল্লোলে তাহা চারিদিকে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিল। যুবক গায়িলেন

“একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপমে।
হার হরি লব মন, জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতা পাঁতি অধরু মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥”

“হেরি হেরি না পূরল আশা”,—গানের এই শেষ চরণটি যুবক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তি করিতে করিতে প্রতিক্ষণে মানসপটে যেন অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন কিন্তু হায়! বাহ্যপ্রকৃতিতে কোথায় সেই অনুপম সৌন্দর্য্য? সে রূপের তুলনা বুঝি সেই নক্ষত্রমালা

ভূষিত সেই নৈশ আকাশে নাই, সেই সৌন্দর্য্য-সুষমা-মণ্ডিত চন্দ্রমায় নাই, আর পদপ্রান্তে প্রবাহিতা যমুনার এই শান্ত স্নিগ্ধ নির্ম্মল শ্যাম সলিলেও নাই। সুতরাং বলিতে হয়, রূপ কোথায়?—রূপ দেহে, না রূপ-উপাসকের মনে?—হায় রূপ, তোমার তীব্র মাদকতায় জর্জ্জরীভূত হইয়া, এই দীন ব্রাহ্মণ পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিবার বাসনা করিয়াছে!

যুবক অনেকক্ষণ সেই নির্জ্জন নদীতীরে বসিয়া রহিলেন। বসন্ত কাল। নদীর শীতল বায়ু শীঘ্রই তাঁহার দেহে শীত অনুভব করাইয়া দিল। তখন তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন। মনে হইল, এখনও অবধি সন্ধ্যাবন্দনাদি কিছুই হয় নাই। মনে মনে একটু হাসিলেন। কহিলেন,

"ভগবন, তোমার মনেও এই ছিল? দরিদ্রের রত্নসিংহাসনে আকাঙ্ক্ষা কেন? যে রত্ন রাজাসন অলঙ্কৃত করিবার যোগ্য, এ দীন দরিদ্র যুবক সে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিতে চায়? তাহার এ কি বাতুলতা?

"আর আমি কি অবিশ্বাসী ও কৃতঘ্ন! যিনি

আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন;—আমার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় সংস্থান করিয়াছেন;—আমাকে যাহার শিক্ষক বা রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন;—আমি মূঢ় ও অধমাত্মা,—আমি কিনা মনে জ্ঞানে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি!—অথবা হায়, এ প্রমত্ত মনকে কে নিবারণ করিবে? দীপ-শিখা দেখিলেই পতঙ্গ তৎপ্রতি ধাবিত হয়; পুড়িয়া মরিবে জানিলেও সে সেই আকর্ষণী শক্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।

"হায়, কোথায় আমার সেই প্রিয় জন্মভূমি—সাধের নন্দনকানন—সুদূর বঙ্গদেশস্থ সেই ক্ষুদ্র পল্লী; আর কোথায় এই বহুলোকসমাকীর্ণ, বহু সৌধ বিরাজিত, বিবিধ কারুকার্য্য খচিত, চাকচিক্যময় মোগলের প্রিয় রাজধানী এই আগ্রা নগরী!' কি জন্য দেশত্যাগী হইয়া,—বৃদ্ধ মাতা, প্রিয়তমা বনিতা, স্নেহের সোদরকে ফেলিয়া এই প্রবাসবাসী হইয়াছি? উদরান্নের সংস্থান করিতে আসিয়া শেষে রমণী-রূপে বিহ্বল হইলাম?—আমার সর্ব্বস্ব হারাইলাম?

"আর সে রমণী কে? আমার প্রভুকন্যা—যবনী

শিষ্যা। যবনী,—সুতরাং অস্পৃশ্যা। অস্পৃশ্যা ?—ওহো! শাস্ত্র, ন্যায়, লোকচার রসাতলে যাক্; আমার ইহকাল, পরকাল, ধর্ম্ম, জ্ঞান, চরিত্র, নীতি অতলজলে নিমজ্জিত হউক,—আমি সেই স্বর্ণ-প্রতিমা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিকে বুকে ধরিতে চাই! সেই বিদ্যুদ্বরণী মোহিনী মূর্ত্তি জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় অহর্নিশ আমায় দগ্ধ করিতেছে। না, না, আগুনও বরং ভাল;—আগুনের দাহিকা-শক্তি মানুষ-পতঙ্গকে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে; আর এই রূপের দাহিকাশক্তি মানুষ-পতঙ্গকে ধিকি ধিকি করিয়া পোড়াইয়া মারে,—ভস্মীভূত করে না!—এও এক বিড়ম্বনা। হায়, আমি কি সাধ করিয়া এ আগুনে ঝাঁপ দিয়াছি! বিধাতা, তুমি জান, এক দিনে আমার এ জীবন-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা হয় নাই,—একদিনে আমি এ অকৃতজ্ঞতা-পাপে পাপী হই নাই!—পাপ? পাপ কি? রূপ দেখিয়া আমি আত্মদান করিয়াছি,—ইহা কি পাপ? সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে আমি আত্মহারা হইয়াছি,—ইহা কি পাপ? কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য শক্তিবশে, বিষম ইন্দ্রিয়-তাড়নায় আমার বিবেক

ও সংযমতা ভাসিয়া গিয়াছে,—ইহাতে কি আমি পাপী ?

"কিন্তু, জগদীশ্বর ! আমার এ কি করিলে ? সত্যই কি আমি উন্মত্ত হইলাম ? আমি কে,—আমার সামর্থ্য কতটুকু,—আমার অবস্থা কি,—তাহা কি সত্য সত্যই ভুলিয়া গেলাম ? তবে, এরূপ আত্মদ্রোহিতার ফল কি ? যাহা পাইব না,—পাইবার নহে,—পাওয়া বিধাতার ইচ্ছা নহে,—তাহার জন্য লোভ করি কেন ? ইহারই নাম কি দুরাকাঙ্ক্ষা ?

"হায় ! আমি দুরাকাঙ্ক্ষার দাস হইয়াছি !—"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"—একথা আমি ভুলিয়াছি !—মৃত্যু ?—মৃত্যু কি, না মরিলে, তাহার স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধি হইবার নয় ; কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া এই যে প্রতিক্ষণে আত্মঘাতী হইতেছি,—মৃত্যু কি ইহাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ? ওহো, এ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকায় যে কষ্ট,—যে তীব্র যন্ত্রণা,—মৃত্যু কি ইহাপেক্ষা অধিক জ্বালাময় ? না, না, বাঁচিয়া থাকাই বিড়ম্বনা ; ইহা একটা সুদীর্ঘকালব্যাপী দুঃস্বপ্ন ;—বুঝি বিধাতার জ্বলন্ত অভিশাপ !—

আমি মরিব,—মনের কথা ব্যক্ত করিয়াই মরিব!”

রূপোন্মত্ত যুবক, এইরূপে আপন মনে কথা-কাটাকাটি করিতেছিলেন। যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিলেন, রাত্রি অধিক হইয়াছে; শীতল বাতাস দেহের সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিয়া দিয়াছে;—কিন্তু হায়, এ শীতলতায় ত হৃদয়-বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই?

যুবক সন্ধ্যা-বন্দনাদির জন্য জলে নামিতে ছিলেন। কি মনে করিয়া নামিতে নামিতে আর নামিলেন না। ভাবিলেন,

“দূর হউক,—আর এ কপটতার প্রশ্রয় দিই কেন? এ ভণ্ডামীতে লাভ কি? আত্মপ্রসাদ ত আমার এ জন্মের মত গিয়াছে,—তবে আর আত্ম-বঞ্চনায় মনকে কলুষিত করি কেন? সন্ধ্যাহ্নিক ত চিত্তশুদ্ধির জন্য; কিন্তু আমার চিত্তশুদ্ধি, চিতা-নলে ছাই হইলেও হইবে কিনা সন্দেহ!—অহো, প্রিয়তমে, তোমার কি কমনীয় কান্তি! এ জীবনে এক দিনের জন্যও কি তোমায় পাইব না?

“হায়, ইষ্টদেবতা! তোমায় আর আরাধনা

করিব কিরূপে? সন্ধ্যা-বন্দনা কি আর এ হৃদয়ে স্থান পায়? ব্রহ্মণ্য-দেব! গুরু-দত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বসিয়া, মন্ত্র ভুলিয়া যাই,—তোমার নাম-জপ বিস্মৃত হই,—তাহার স্থানে একটি জ্যোতির্ম্ময়ী মানবী-মূর্ত্তি ধ্যান করিতে থাকি! একখানা লাবণ্যভরা হাসি হাসি মুখ,—প্রীতি-প্রফুল্লতামাখা দুটা বড় বড় চোক,—সদাই এই আঁখি দুটার মাঝে জাগিতে থাকে। চক্ষু মুদিয়া সে মূর্ত্তি ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু হায়, সে মূর্ত্তি তখন আরও উজ্জ্বলরূপে বুকের ভিতর জাগিয়া উঠে। তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাই,—ভুলিয়া সেই মানবীর চরণে—কি বলিব অন্তর্য্যামি!—সে মানবী রূপের জীবন্ত প্রতিমা;—আমি আপনা হারাইয়া সেই রূপ-প্রতিমায় আত্মসমর্পণ করিয়াছি! আমি মজিয়াছি;—দেব, আমায় ক্ষমা কর; এ জীবনে যথা জ্ঞানে বুঝি আর তোমার পূজা করিতে পারিব না!"

যুবকের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া [illegible]সিল; স্বর আর্দ্র হইল। সেই আর্দ্র স্বরে, গদগদকণ্ঠে সঙ্গীতপ্রাণ যুবক পুনরায় গাহিলেন,—

"কি চোকে দেখেছি তারে।
সদা জাগে সে প্রতিমা কি আলোকে কি আঁধারে॥
ধরি ধরি এই পাই, আর যেন সেথা নাই,
শূন্য প্রাণে শূন্যে চাই, বুক ভাসে শত ধারে॥"

যুবক আপন মনে গান গায়িতে গায়িতে গৃহে ফিরিলেন। মনে মনে কহিলেন,

"হায় মেহের, কেন তুমি এত সুন্দর হইয়া ছিলে? তোমার রূপ-রশ্মিতে পুড়িয়া মরিব বলিয়াই কি আমি প্রবাসবাসী হইয়া ছিলাম? জগদীশ্বর, রক্ষা কর! মেহেরকে যেন আমি ভুলিতে পারি। থাক্, আজ আর পড়াইতে যাইব না।"

'মেহের',—কে মেহের? সেই বিজন মরুভূমে জন্মগ্রহণকারিণী ঘিয়াস-দুহিতা কি? হাঁ, এই হিন্দু যুবকই ত সেই অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকার একজন শিক্ষক!

হায়, দরিদ্র যুবক! সত্যই তুমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন গলে আপনি ফাঁসি দিয়াছ!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সৌভাগ্যবতী মেহেরলুন্নেসা যে ভাবে বৰ্দ্ধিতা ও শিক্ষিতা হইতেছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমরা সংক্ষেপে একরূপ বলিয়া আসিয়াছি। পূৰ্ব্ব পরিচ্ছেদে যে হিন্দু যুবকের কথা উল্লিখিত হইল, ইনি মেহেরলুন্নেসাকে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য এবং বৈষ্ণবকবিগণের গীত শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই হিন্দু যুবক বিবাহিত, বয়স চব্বিশ পঁচিশ, নাম সুরনাথ শৰ্ম্মা। ব্রাহ্মণের বাস বাঙ্গলা দেশে,—বীরভূম অঞ্চলে। কর্ম্মোপলক্ষে তিনি আগ্রাবাসী হইয়াছেন। বাদসাহের দপ্তরে,—কোষাধ্যক্ষ ঘিয়াসবেগের অধীনে তিনি মুন্সীর কাজ করিতেন। ঘিয়াস যখন যেখানে যাইতেন, এই ব্রাহ্মণ মুন্সী তাঁহার সমভিব্যাহারী হইতেন। সম্প্রতি লাহোর

হইতে আগ্রায় বাদসাহের বিচার-সভা স্থানান্তরিত হওয়ায়, ঘিয়াসের সহিত সুরনাথও আগ্রাবাসী হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ দিবাভাগে রাজ-সরকারে কর্ম্ম করিতেন; সন্ধ্যার পর কোষাধ্যক্ষের বাটীতে তাঁহার কন্যাকে পড়াইতে আসিতেন। এজন্য তাঁহার স্বতন্ত্র বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল।

ছাত্রীকে শিক্ষা দিতে আসিয়া শিক্ষকের যেরূপ মনোবিকার হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়া আসিয়াছি।

দিবাভাগে একজন মৌলবী আসিয়া মেহেরকে আরবী ও পারসী শিক্ষা দিতেন। মেহের এই মৌলবীর নিকট অনেক পারসী বয়েৎ শিখিয়াছিলেন। এবং তাহার অনুকরণে পারসীতে উত্তম কবিতা রচনা করিতেও পারিতেন।

অপরাহ্ণে একজন বাইজী আসিয়া মেহেরকে নৃত্য-গীত-বাদ্য শিক্ষা দিত। ইহা ব্যতীত চিত্র, শিল্প, কারুকার্য্যাদির শিক্ষা,—সে ত আছেই। বলা বাহুল্য, তজ্জন্যও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত ছিল।

এইরূপ যত কিছু সুকুমার কলা-বিদ্যা আছে,

বুদ্ধিমতী মেহের অল্পদিনেই সমস্ত আয়ত্ত করিলেন। যাহার অনুরাগ আছে, যত্ন আছে, শিখিবার প্রবৃত্তি আছে, তাহার উপর সর্ব্বপ্রকার সুবিধা আছে, তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে কেন? ষোড়শবর্ষ বয়সের মধ্যেই পরম রূপবতী মেহের,—বিদ্যাবতী বলিয়াও প্রখ্যাতা হইলেন। তাঁহার অতুল্য রূপ ও অশেষ গুণাবলীর কথা, লোকমুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আত্মজার এইরূপ প্রশংসায়, ঘিয়াস অপার আনন্দলাভ করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর মেহের আপন সুসজ্জিত পাঠগৃহে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানি সংস্কৃত পুঁথি পাঠ করিতেছেন; সম্মুখে স্বতন্ত্র আসনে তাঁহার সেই হিন্দুশিক্ষক উপবিষ্ট। সুদৃশ্য দীপাধারে সুবর্ণ দীপ জ্বলিতেছে। সুগন্ধ-তৈলে গৃহ আমোদিত হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্রী ভিন্ন, সে গৃহে আর কেহ নাই।

শিক্ষক নিবিষ্ট মনে, নির্নিমেষ নয়নে, ছাত্রীর মুখ পানে চাহিয়া আছেন। সে চক্ষে পলক আর পড়ে না। দীপশিখার স্থির উজ্জ্বল আলোক কেমন বালিকার লাবণ্যময় মুখের উপর পড়ি-

য়াছে,—মনে মনে আবৃত্তি করা হেতু তাহার ফুল্ল কুসুমতুল্য ওষ্ঠাধর দু'খানি কেমন মৃদু মৃদু নড়িতেছে,—সুবাসিত সুকুঞ্চিত অলকাগুচ্ছগুলি কেমন বালিকার কপোল বাহিয়া,—সর্পশিশুর ন্যায় সেই মুখপদ্মে দুলিতেছে,—শিক্ষক একাগ্র মনে অনিমেষ নয়নে তাহা দেখিতে লাগিলেন। আবার যখন সেই নবীনা কিশোরী আদিরস-ঘটিত কোন শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈষৎ সলজ্জভাবে স্মিতমুখে আপন পরিধেয় বসনাঞ্চল ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া একবার শিক্ষকের মুখপানে চাহিয়া পরক্ষণে পাঠ্যবিষয়ে মনোযোগী হইলেন; যখন সেই মুখের হাসি লুকাইতে গিয়া বালিকার সেই কজ্জলশোভিত আকর্ণবিস্তৃত বিশাল আঁখিযুগলও ঈষৎ হাসিল; এবং যখন সেই নীরব হাসির নীরব হিল্লোলে বালিকার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া একটি বিদ্যুৎ চলিয়া গেল,—তখন সেই যুবকশিক্ষকের বুকের ভিতর সমুদ্রমন্থন হইতে লাগিল,—তাঁহার দেহ কন্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি ভয়ে ভয়ে একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,

"মেহের, ও স্থানটা কি কঠিন ঠেকিতেছে?"

বীণাবিনিন্দিস্বরে বালিকা উত্তর করিল, "না মহাশয়, ভাবার্থ বুঝিয়াছি,—দু' একটা কথা ঠেকিতেছে মাত্র।"

"স্থানটা একবার আবৃত্তি কর দেখি?"

রসিকা কিশোরী একটু হাসিল। সে হাসিতে সুধা ক্ষরিল। শিক্ষক মহাশয়ের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। তিনি কপোলদেশ কণ্ডুয়ন করিবার অছিলায়, কৌশলে হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া ভূমিপানে মুখ নত করিয়া রহিলেন।

মেহের পড়িলেন,—

"প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমল মধুপানং।"—

শিক্ষক বলিলেন, "হাঁ বুঝিয়াছি।—মেহের, গীতগোবিন্দের সকল স্থানই এইরূপ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-গাথায় পূর্ণ। তুমি একটি গান গাও দেখি, শুনি।"

চতুরা মেহের শিক্ষকের মনের ভাব কিছু কিছু অবগত হইয়া ছিলেন। আজ কয়দিন হইতে

তিনি তাঁহাকে কিছু আন্‌মনা ও শঙ্কিত অবস্থায় দেখিতেছেন। তিনি বুদ্ধিমতী ও সুরসিকা; শিক্ষককে ইহার কি কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া গীতচ্ছলে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। মধ্যে মধ্যে এরূপ গানও চলিত।

মেহের সুধাকণ্ঠে বিদ্যাপতির সুধার সমুদ্র মন্থন করিয়া গায়িলেন,—

"আজি কেন তোমার এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব অপঘাত হৈয়াছে পারা॥"

গায়িতে গায়িতে মেহের মধুর কটাক্ষে দেখিলেন, তাঁহার শিক্ষক অনিমেষ নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন;—যেন কি বলি-বলি করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। ফুল্ল বিম্বাধরে মেহের একটু হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে গায়িতে লাগিলেন,—

"যদি বা না কহ লোকের মাঝে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥
আচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥
বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পীরিতি বিষম বড়॥"

"গোপত পীরিতি বিষম বড়"—গানের এই শেষ চরণটি, মেহের এমনই হাব-ভাব-বিলাসিতার সহিত বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, শিক্ষক মহাশয়ের গলদঘর্ম্ম হইবার উপক্রম হইল। সহৃদয়া মেহের ভাবিলেন, "আর না, ব্রাহ্মণকে আর লজ্জা দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। রূপ দেখিয়া যে উন্মত্ত হয়, তাহার সহিত বিদ্রূপ করিতে নাই।"

প্রকাশ্যে কহিলেন, "গান কেমন শুনিলেন?—আপনার শিষ্যার যোগ্য গান ত বটে?"

শর্ম্মা সুরনাথ নিরুত্তর। বুঝিলেন, প্রখরবুদ্ধি-শালিনী মেহের, তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার হৃদয়চ্ছবি দেখিয়া লইয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, "যে কথা বলিব-বলিব করিয়া বলিতে পারিতেছি না,—যা থাকে অদৃষ্টে,—আজ তাহা বলিব। মেহের

আজ আপনা হইতে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। আজ তবে প্রাণের জ্বালা নির্ব্বাপিত করি,—বিদায় লই।”

প্রকাশ্যে কহিলেন, “মেহের, তুমি বড় সুন্দর।”

শিক্ষকের আকৃতি ভয়-চকিত, স্বর কম্পিত।

মেহেরন্নেসা একটু হাসিয়া, ভূমিপানে মুখ নত করিয়া উত্তর দিলেন,—“সহসা আজ এ কথা কেন ঠাকুর?”

“না, তাই বলিতেছি,—তুমি বড় সুন্দর।”

এবার মেহের আর কোন উত্তর দিলেন না,—সম্মুখস্থ পুঁথির পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন।

সুরনাথ কহিলেন, “মেহের, সত্যই তুমি বড় সুন্দর। কবি-কল্পনা ব্যতীত তোমার মত রূপবতী রমণী নরলোকে আর সম্ভবে না।”

এবার মেহের উত্তর দিলেন; কহিলেন,

“কেন, আপনাদের বাঙ্গলাদেশে কি আমার মত সুন্দরী রমণী দেখেন নাই?”

“বাঙ্গলা দেশ!—সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে এমন অপরূপ রূপ-প্রতিমা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।”

"সুতরাং বলিতে হয়, আপনার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ।—এ বিশাল পৃথিবীতে আমাপেক্ষা কত সুন্দরী আছেন,—আপনি তাঁহাদের বিষয় অবগত নন।"

"না মেহের, তা নয়। হস্তী নিজে বুঝিতে পারে না,—তাহার দেহে কত বল। সৌন্দর্য্যের সীমাবর্ত্তিনী আদর্শ সুন্দরী তুমি;—স্বভাবের গতির এইখানেই শেষ;—সৌন্দর্য্য ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া তোমার দেহে বিরাজিত। আমি চাটুকার নহি,—স্বরূপ কথা তোমায় বলিতেছি,—এই জীবন্ত সৌন্দর্য্য-প্রতিমার চরণতলে রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তীর গৌরব-মুকুটও তুচ্ছ!"

"সে কি?"

"তুমি বুঝিতেছ না, মেহের! এ রূপ কখন বৃথায় যাইবে না। প্রকৃতির নিয়ম তা নয়। শুনিয়াছি ত তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত?—এ অপরূপ রূপ বৃথায় যাইবার হইলে, সেই ভীষণ মরুভূমে কে তোমায় বাঁচাইল? করাল কালসর্পের মুখ হইতে কে তোমায় রক্ষা করিল? কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও,—উপযুক্ত পতি লাভ করিয়া পৃথিবীতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাও।—

আমি আর তোমার সম্মুখে থাকিয়া চিত্তবৃত্তি মলিন করিব না;—জন্ম জন্মান্তরের মহাপাতক সঞ্চয় করিয়া নীরয়গামী হইব না।"

"আপনি ও কি কথা বলিতেছেন?"

"যাহা বলিতেছি, মন দিয়া শুন।—তুমি বুদ্ধিমতী; পূর্ব্ব হইতেই আমার মনের ভাব অবগত আছ,—এখন আরও অবগত হও। দেখ, আমি অবিশ্বাসী নহি;—এ অবধি যাহা কিছু ঘটিয়াছে, আমি মুক্তকণ্ঠে তাহা ব্যক্ত করিব।—সত্যই তোমার রূপে আমি উন্মত্ত হইয়াছি। তোমার ঐ প্রখর রূপ-রশ্মি আমার অন্তর বাহির দাহ করিতেছে। আমি মূঢ়,—দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, গুরু-শিষ্যার যে সম্বন্ধ,—আমার যে অবস্থা,—তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

"তবে আমি যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহা সত্য?"

"সত্য,—অতি সত্য। তুমিই আমার এখন জপ তপ ধ্যান ধারণা হইয়াছ। ইষ্টদেবতা আর এ হৃদয়ে স্থান পান না,—তোমার মোহিনী মূর্ত্তিই এখন আমার সকল স্থান অধিকার করিয়াছে।

কি বলিব মেহের,—আমি নিদ্রা যাই, স্বপ্নে তোমার ঐ অনিন্দ্যসুন্দর মুখচ্ছবি দেখি। তুমি আপন মনে পাঠ অভ্যাস কর,—আমি অনিমেষ-নয়নে তোমার রূপ-সুধা পান করি। তোমার মুখ দেখিলে আমার স্বর্গের কথা মনে পড়ে। কিন্তু হায়, আমি জানিতাম না যে, এ ব্যাধির ঔষধ নাই। তাহা হইলে স্বেচ্ছায় এ কালকুট সেবন করিতাম না।—মেহের, তুমি নিজগুণে আমায় মার্জ্জনা কর।”

“তবে, আমিই আপনার জীবনকে বিষময় করিয়াছি? উপযুক্ত গুরু-দক্ষিণা দিলাম বটে!”

“না মেহের, তা নয়।—আমিই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিব। বিস্মৃতিকে আয়ত্ত করা ভিন্ন আমার এ ব্যাধির ঔষধ নাই। তাই তোমার নিকট বিদাই লইব। কিন্তু হায়, বিস্মৃতি কে দিবে? যতবার তোমায় ভুলিব মনে করিয়াছি, ততবারই তোমার মোহকরী মূর্ত্তির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছি। তুমি কি বলিয়া দিতে পার মেহের, কিরূপে তোমায় বিস্মৃত হই? দেখ, আমি আপনাকে বড় সংযত-চিত্ত,

বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানিতাম; আজি বুঝিলাম, সে সব মিথ্যা। হায়, আমার চিত্ত অবশ! বলিয়া দাও মেহের, বিস্মৃতি কোথায়?”

“কেন, বিস্মৃত হইবেন কি জন্য? আপনিই ত আমায় কতবার শিক্ষা দিয়াছেন,—‘ভালবাসাই মনুষ্যত্ব; আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন কেহ কাহাকে ভালবাসিতে পারে না’।”

“কথা সার বটে; কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি অতটা শক্তি ধারণ করিতে পারে না। তোমায় স্বরূপ বলিব,—আমার এ ভালবাসা ঠিক ভালবাসা নয়। ইহাতে আত্মবিসর্জ্জন নাই,—আত্মপ্রতিষ্ঠা আছে।—পাপমুখে পাপকাহিনী ব্যক্ত করিলাম; এক্ষণে তুমি আমাকে বিদায় দাও।”

ক্ষণকাল দুইজনেই নীরব। শিক্ষকের হৃদয় অনেকটা ভারমুক্ত; ছাত্রীর হৃদয় মেঘাচ্ছন্ন;—তাঁহার নয়নপ্রান্তে দুইবিন্দু জল।

সেই হেমপ্রভার বিশাল নয়নপ্রান্তে জল দেখিয়া, শিক্ষক কিছু বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, “বালিকার হৃদয় এত উচ্চ? আমি যে কাহিনী ব্যক্ত করিলাম, তাহাতে শৃঙ্খলা-

বদ্ধ না হইয়া সহানুভূতির অমৃত-অশ্রু উপহার পাইলাম? বুঝিলাম, এ সুন্দর রূপ-মন্দিরে দেবতা ভিন্ন সাধারণ মানবের অধিষ্ঠান হইবে না! এখন স্বতই মনে প্রশ্ন হয়,—এ যবনীর দেহ অধিক সুন্দর, না হৃদয় অধিক সুন্দর? ধন্য সেই বিধাতা, —যিনি এ জীবন্ত প্রতিমার হৃদয় বাহির এমন সুন্দর করিয়া গড়িয়াছেন!"

মণি-মুক্তাখচিত সেই পরিধেয় সূক্ষ্ম বসনাঞ্চলে মেহের আপন চক্ষু দুইটি মুছিয়া গদগদস্বরে শিক্ষককে কহিলেন, "তবে আপনি এ স্থান ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন?"

আবার সেই দয়ার্দ্র প্রকৃতি-দর্পণে,—সেই মাধুর্য্যময় বিশাল লোচনে জল দেখা দিল।

শিক্ষক সুরনাথ চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিলেন, "আজ আমি ক্ষুদ্র বালিকার নিকট পরাজিত হইলাম।—আর কখন আপন হৃদয়ের বড়াই করিব না।"

প্রকাশ্যে কহিলেন, "অগত্যা।—স্থানান্তর গমন ভিন্ন আমার মঙ্গল নাই। আমার চিত্ত অবশীভূত।"

বুদ্ধিমতী মেহেরও বুঝিলেন, "তাহাই শ্রেয়ঃ। এমত অবস্থায় পরস্পরের সাক্ষাৎ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

প্রকাশ্যে কহিলেন, "গুরুদেব, আপনি যাই-বেন—যান ; কিন্তু মনে স্থির বিশ্বাস রাখিবেন, আমি একদিনের জন্যও আপনার প্রতি এতটুকু বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হই নাই। আপনি আত্মানু-শোচনা করিয়া দুঃখ পাইবেন না। দেখুন, যে ব্যক্তি নির্ব্বিকার চিত্তে সত্যকথা ব্যক্ত করে, সে পৃথিবীর মধ্যে নিশ্চয়ই একজন অসাধারণ লোক। এ মিথ্যার সংসারে যে সত্য বলে, তাহাকে আমি বড় ভালবাসি। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরদিন অবিচলিতা ; আজ সেই শ্রদ্ধার সহিত আরও একটু জিনিস মিশ্রিত হইল,—যাহা আমার স্মৃতিপথে আজীবন জাগরূক থাকিবে।"

এই বলিয়া সেই উন্নতহৃদয়া বালিকা আপন কনক করাঙ্গুলি হইতে একটি বহুমূল্য জহরৎপূর্ণ হীরকখচিত অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া শিক্ষকের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। সুরনাথ নির্ব্বাক্,

নিস্পন্দ, বিস্মিত, চমৎকৃত। মেহেরের সেই নবনীত স্নিগ্ধ কোমল কর তাঁহার করস্পর্শ হইল। তিনি শিহরিলেন।

একি স্বপ্ন, না প্রহেলিকা ?

মেহের বলিলেন, "গুরুদেব, গুরু-দক্ষিণা-স্বরূপ এই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব স্মৃতি আপনার করাঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলাম,—ইহা দেখিয়া যবনী শিষ্যাকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিবেন।"

সুরনাথ মুখ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, মেহেরলন্নেসার চক্ষু আবার অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। উজ্জ্বল দীপালোকে সে চক্ষু অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। উভয়ে উভয়ের পানে চাহিলেন। কাহারও মুখে বাক্‌স্ফূর্ত্তি নাই,—মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়ের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।—সে কক্ষে আর কেহ নাই।

সুরনাথ সত্যই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। মনে মনে বলিলেন, "মেহের তুমি আমাকে অঙ্গুরীয় উপহার দিয়া আমার সংবর্দ্ধনা করিলে ;—আমি তোমাকে প্রাণ উপহার দিয়া জন্মের মত আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম।"

সেই দিনই প্রত্যূষে, নৌকাযোগে সুরনাথ স্বদেশযাত্রা করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে ঘিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন, কোন বিশেষ কারণে তিনি কর্ম্মত্যাগে বাধ্য হইয়া অদ্যই স্বদেশ গমন করিবেন। অগত্যা নানারূপ পুরস্কৃত করিয়া, ঘিয়াস বেগ অনিচ্ছার সহিত ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার অল্প দিন পরে, সুখময় বসন্ত-কালে, এক দিন অপরাহ্নে মেহেরল্‌নেসা সহচরীগণ-পরিবৃতা হইয়া, যমুনায় তরী বিহার করিতেছিলেন। সুন্দর যমুনার স্বচ্ছ শ্যাম সলিলে সুন্দরীগণের নৌকা-বিহার—কি মনোহর দৃশ্য! স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী আগ্রা নগ[illegible]ক শোভাময়ী করিয়া ধীর মন্থরগতিতে প্রবাহি[illegible] হইতেছে; চারিদিক হইতে লোকশ্রেণী আসিয়া [illegible]ন শোভা সন্দর্শন করিয়া যাইতেছে; প্রস্তর[illegible]ত সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ গুলি উন্নতমস্তকে ত[illegible] নিরীক্ষণ করিতেছে;—সেই সুন্দর স্বচ্ছ যমুনা সলিলে, সুখ-বসন্তে, সুন্দরী মেহেরল্‌নেসা সাধের তরী ভাসাইয়াছেন। প্রকৃতির সু[illegible]ন্দর্যের সহিত

সম্বন্ধ স্থির রাখিবার জন্য, মার্জ্জিত-রুচি মেহের, নৌকার মধ্যেও বসন্তের আবির্ভাব করিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার সহচরীবৃন্দ মনোহর বাসন্তী রংয়ের পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া, যুবতী যৌবনের শোভা সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের কমনীয় দেহ আজি মণি-রত্ন-হীরক বর্জ্জিত; তাহার স্থানে নয়নরঞ্জন নানা-শ্রেণীর ফুলাভরণ সুসজ্জিত।—ফুলের হার,ফুলের বলয়, ফুলের কাণ, ফুলের সিঁথী, ফুলের রতনচূড়, ফুলের চন্দ্রহার,—সমস্তই ফুলে প্রস্তুত। কণ্ঠে, কক্ষে, বক্ষে,নিতম্বে যেখানে যেটি যে ভাবে সাজে, সেখানে সেইটি সেইভাবে সজ্জিত। সুদৃশ্য তরী-খানিও বাসন্তী রঙ্গে চিত্রিত। তরীর উপর পুষ্প-মাল্য-ভূষিত যে সকল শ্রেণীবদ্ধ পতাকা উড়িতেছিল, সে পতাকাগুলিও বাসন্তী রঙ্গে রঞ্জিত। এই অপরূপ সাজে, মনোহর ভঙ্গীতে সুন্দরীগণের সাধের নৌকাবিহার;—সুখ-বসন্তে বাসন্তী ভূষণে ভূষিত হইয়া গান গাহিতে গাহিতে উন্মুক্ত তরীতে যমুনা-বিহার। পাঠক, কল্পনা-নয়নে একবার সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করুন।

নির্ম্মল যমুনা সলিলে মৃদুমধুর মলয়ানিল বহিতেছে,—আর সেই স্বচ্ছ সলিলোপরি যেন একটি স্বর্ণসিংহাসন ধীরে ধীরে আপন গৌরবে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই সিংহাসনের মধ্যস্থলে সৌন্দর্য্যের রাজ্ঞী সমাসীনা; চতুষ্পার্শ্বে পাত্রমিত্র সভাসদস্বরূপ সুন্দরী সখীবৃন্দ উপবিষ্টা। সুন্দরী বাহিকা, সুন্দরী গায়িকা,—তরীতে পুরুষ কেহ নাই। রৌপ্যমণ্ডিত হাল, রৌপ্যমণ্ডিত দাঁড়, রেশমী রজ্জু, সুন্দরীগণের কুসুমকোমলহস্তে নৌকা চালন,—সে শোভা যে দেখিল, সেই মোহিত হইল। মধুর পুষ্পগন্ধের সহিত সুন্দরীগণের দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব সৌরভ উত্থিত হইয়া চারিদিক্ আমোদিত করিল। সে সৌরভে দর্শকের প্রাণ আকুল হইল। সুন্দরীগণের সেই মধুর হাবভাব, সেই সুধাপূর্ণ বিলোল কটাক্ষ, সেই সরস হাস্যপরিহাস, সেই ঈষদালস্যে কটির বসন ঈষৎ শ্লথ হওয়ায় পরস্পরের অঙ্গে পরস্পরের অঙ্গলক্ষা,—দর্শকগণের মন চঞ্চল করিয়া তুলিল। নির্ম্মল নদীজল ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে,—তদুপরি ঐ সুদৃশ্য সুগঠিত পুষ্পমাল্য-শোভিত বাসন্তী রঙ্গে

তরী ভাসিতেছে,—তরীস্থিত পতাকাসকল পত পত উড়িতেছে,—আরোহিণী সুন্দরীগণ সুস্বর তান-লয়-সংযোগে গান গাহিতে গাহিতে দিক্‌-সকল মুখরিত করিতেছে,—সে শোভা যে দেখিল, সেই আপনা হারাইল। তরীর মধ্যস্থলে সমাসীনা, প্রকৃতির সেই চারুচিত্র,—সেই সৌন্দর্য্যপ্রতিমা শোভারাণী,—আপন গৌরবে গৌরবময়ী হইয়া চম্পকদলনিন্দিত সুন্দর ও সুকোমল অঙ্গুলিস্পর্শে মধুর বীণাধ্বনি করিতেছেন, আর নৌকাবিহারিণী সুন্দরী সখীবৃন্দ সেই সুধাস্বরে আপনাদের মধুর কণ্ঠস্বর মিলাইয়া, দিক্‌দিগন্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া গাহিতেছেন। গানের তালে তালে নৌকা ধীর-ভাবে চলিতেছে। সুন্দরীগণ গাহিতেছেন,—

"আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর-কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥" ইত্যাদি।

কখন বা গাহিতেছেন,—

"এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোমার হৃদয় অনুবন্ধ॥

তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার।
ফারয়ু কাঁচুলী ডারয়ু হার॥
কর অবসান নাহি সিঞ্চই নীর।
এতখনে অবহুঁ না পাওল তীর॥
হাম নিরাশ তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহ জীউ তেজই কেহ হরিবোল॥
এতদিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥
উঠত কূলে পার যো তুয়া লাগ।
কাঁহ সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ॥"

সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে, নৌকা বাহিতে বাহিতে, সুন্দরীবৃন্দ বৈষ্ণব কবিগণের এই সব প্রেম-গাথা গাহিতে লাগিলেন। সঙ্গীতের এই সম্মোহন স্বরের সহিত রূপসীগণের রূপরাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। অদূরে এক প্রাসাদের গবাক্ষ-পথে দাঁড়াইয়া এক পরম-সুন্দর যুবা-পুরুষ একাগ্রমনে রূপসীগণের এই রূপ-সুধা পান করিতেছিলেন। বিশেষতঃ রূপসী-গণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—যাঁহার আসন সকলের মধ্যবর্ত্তিনী,—সেই রূপ-রাজ্ঞীর অপূর্ব্ব মুখ-কমলের প্রতি,—ঐ যুবা পুরুষ অনিমেষ নয়নে

চাহিয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকায় তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি তখন এক অনুগত পরিচারককে ডাকিয়া কহিলেন,

"মন্নু, তুমি এখনই গিয়া ঐ সুন্দরীগণের পরিচয় জানিয়া আইস। বিশেষতঃ উহাদের মধ্যে যাহাকে কর্ত্রী বলিয়া বোধ হইতেছে, উহাঁর সবিশেষ পরিচয় অবগত হইতে চাও।"

"জাঁহাপনার হুকুম এ নফর এখনই তামিল করিবে।"

এই যুবাপুরুষ অন্য কেহ নহে,—স্বয়ং বাদসাহ-পুত্র,—ভাবী ভারত-সম্রাট যুবরাজ সেলিম।

মন্নু নামে সেই অনুচর তখনই এক খানি বেগগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া সুন্দরীগণের নিকটবর্ত্তী হইল। এবং সুন্দরীগণকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া কহিল,

"হে সুন্দরীবৃন্দ! এ দাস কিয়ৎক্ষণের জন্য আপনাদের বিহার-সুখে বাধা দিতেছে,—দাসের অপরাধ লইবেন না—"

একজন সহচরী উত্তর করিল, "তুমি কে? তোমার কি প্রয়োজন?"

"সুন্দরীগণের পরিচয় লইতে আমার এখানে আগমন ;—ভারতের ভাবী ভাগ্য বিধাতা যুবরাজ সেলিম আপনাদের পরিচয় জানিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।—আপনাদের কর্ত্রী কে ?"

এই প্রশ্ন করিয়াই অনুচরের সম্ভ্রম দৃষ্টি, মেহেরল্‌নেসার উপর পড়িল। তখন সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, পুনরভিবাদন পূর্ব্বক মেহেরল্‌নেসাকে কহিল, "নফরের গোস্তাকি মাপ করিবেন,—আপনার কথাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। যুবরাজ সেলিম আপনার পরিচয় লইতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

অনুচর মনে মনে বলিল, "আ মরি মরি! এমন রূপ! এ জীবনে এমনটি ত আর কখন দেখি নাই! বুঝিলাম, যুবরাজের সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই অনুপমা ললনার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে।"

মেহেরল্‌নেসা, উদ্দেশে যুবরাজকে অভিবাদন করিয়া কিঙ্করকে কহিলেন,

"তোমার প্রভুকে কহিও, এ বাঁদীকে লোকে মেহেরল্‌নেসা বলিয়া সম্বোধন করে। পিতা,—

রাজ-অন্নে প্রতিপালিত—রাজকীয় কোষাধ্যক্ষ ঘিয়াস বেগ। ইহাঁরা আমার সঙ্গিনী।”

অনুচর যথারীতি অভিবাদন করিয়া নৌকা লইয়া প্রস্থান করিল। মনে মনে বলিল, “কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের জোর-কপাল। স্বয়ং বাদ-শাহ-পুত্র—ভাবী ভারতসম্রাটের দৃষ্টি,—তাঁহার কন্যার উপর পড়িয়াছে।”

মেহের মনে মনে ভাবিল,—“একি, আজ আত্মপরিচয় দিতে সহসা বুকের ভিতর এ তরঙ্গ উঠিল কেন? হৃদয়ে যে অতি উচ্চ আশা স্থান পাইতেছে? জ্যোতিষি-বাক্য কি তবে ফলিবে? আমি রাজেন্দ্রাণী হইব? ভারত-সিংহাসন আমার করতলস্থ হইবে? বিধাতা,—তুমিই জান, এ চিন্তার পরিণাম কি? থাক্, মনের এ চারু-চিত্র মনোমধ্যেই থাক্। এ উচ্চতম কল্পনা আপন মনে অনুভব করিবার,—অন্যকে বলিবার নহে।—মরুভূমে আমার জন্ম; কালসর্প আমার মস্তকে ফণা ধরিয়াছিল; ভারত-সম্রাট আকবরের জন্মও এইরূপ। একের ভাগ্যে যাহা ফলিয়াছে, অন্যের ভাগ্যেও তাহা ফলিবে কিনা, কে বলিতে পারে?

ভারতের ভাগ্য-বিধাতা যুবরাজ সেলিম আমার পরিচয় জানিতে উৎসুক ?—[illegible], স্থির হও।”

প্রকাশ্যে বলিলেন, “চল সখিগণ, গৃহে ফিরি। শীতল বাতাসে শরীর শীতল হইয়াছে।”

প্রধানা সখী মেহেরের চিবুক ধরিয়া সোহাগ-ভরে হাসিতে হাসিতে বলিল, “শরীর শীতল হইয়াছে বটে, মনের উষ্ণতা কিন্তু বাড়িয়াছে।”

তখন সঙ্গিনীগণ নৌকা বাহিতে বাহিতে, এই গানটি গায়িতে গায়িতে আবাসে প্রস্থান করিল,—

“হিয়ার মাঝারে, য[illegible] রাখিব,
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে না দেখি, জনম স্বপনে,
না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস র[illegible],
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী, পরের অধীনী,
সকলি পরের বশে।

সদাই এখনি,　　　পরাণ পোড়নি,

ঠেকিনু পীরিতি রসে ॥”

তার পর সকলে উল্লাসধ্বনি করিয়া গায়িতে গায়িতে চলিল,—

“সকল সখীগণ চলু ঘর যাই।

নব নব রঙ্গিনী রসবতী রাই ॥

মানস সুরধুনী দুকূল পাথার।

কৈছনে সহচরী হোয়ব পার ॥”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘিয়াসবেগ, প্রিয়তমা আমিনার শোকস্মৃতির সম্মানার্থ, প্রতিবৎসর এক মহাভোজের আয়োজন করিতেন। সে ভোজ-সভায় রাজ্যের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইতেন। উজীর ও ওমরাহগণ বিশেষ সম্মানের সহিত সে দিন রাজস্ব-সচিবের বাটীতে আতিথ্য-গ্রহণ করিতেন। পারস্যদেশের রীত্যনুসারে সে দিন গৃহস্বামীর কুলকন্যারা বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিমন্ত্রিতগণের আদর-অভ্যর্থনায় নিযুক্ত থাকিতেন, এবং নৃত্যগীত প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন করিতেন। রজনীতে এই উৎসব-ক্রিয়া সমাধা হইত। শোক-সভা ক্রমে উৎসব-সভায় পরিণত হইয়াছিল।

এবারের উৎসব-আয়োজন কিছু অধিকমাত্রায়

হইয়াছে। এবার স্বয়ং বাদসাহ-পুত্র যুবরাজ সেলিম এই ভোজ-সভায় উপস্থিত হইবেন,—এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভুভক্ত ঘিয়াস বিধিমতে আতিথ্য-সৎকারের উদ্যোগ করিলেন।

সেলিম যে, এবার আপনা হইতে রাজস্বসচিব ঘিয়াস বেগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সপারিষদবর্গ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইবেন বলিয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। সেই সখিগণ-পরিবৃতা সুবর্ণনলিনী—রূপসী মেহেরন্নেসাকে দেখিয়া এবং তাঁহার পরিচয় পাইয়া সেলিম সর্ব্বদাই সেই কন্যারত্নকে দেখিবার সুযোগ খুঁজিতেন। বিশেষ তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, এই নবযৌবনসম্পন্না অপূর্ব্ব রূপবতী আজিও অবিবাহিতা, তখন তাঁহার পুনর্দর্শন-লালসার সহিত আরও একটি দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে একবার আপন চক্ষে তন্ন তন্ন করিয়া দেখা এবং সেই সুন্দরীর গুণগ্রামের পরিচয় লওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল।

এখন খিয়াসের এই সাদর নিমন্ত্রণ উপলক্ষে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ যথেষ্ট সুগম হইল।

এক সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে নিমন্ত্রিতগণ আসীন হইয়াছেন। কক্ষের চারিদিকে সুদৃশ্য আলোকমালা সজ্জিত হইয়াছে। আলোকাগারের সুগন্ধ-তৈলে চারিদিক আমোদিত। দেয়ালের চারিদিকে বিচিত্র চিত্রপট শোভিত। একখানি মূল্যবান্ উৎকৃষ্ট গালিচায় আসর-শয্যা হইয়াছে। সেই গালিচার উপরিভাগে বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত এক খানি মসৃণ বস্ত্র আবৃত। তদুপরি আমীর-ওমরাহগণ পর্য্যায়ক্রমে উপবেশন করিয়াছেন। মধ্যস্থলে, আর একটি স্বতন্ত্র উজ্জল আসনে কুমার সেলিম সমাবিষ্ট। তাঁহার পারিষদ-বর্গ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে।

খিয়াস নিমন্ত্রিতগণের সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান-সম্ভাষণ ও আদর-আপ্যায়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কুমারী মেহেরলৃনেসা সখিগণ সমভিব্যাহারে সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আবির্ভাব মাত্র সহসা সেই স্থান, যেন

জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, তাহা সেলিমে কবিগণের হইল, যেন এই নিশাকাংবর্দ্ধনা করিলেন প্রায়ই হইতেছে। সকলে বিস্ময়-পূর্ণ ভরিয়া,—মেহে-কুমারীর পানে চাহিয়া রহিলেন করিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, ধীর পাদবিক্ষেপে মস্বাদু সুরা-সভার মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরিবার সকলকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া স্বহস্তে প্রেন একটি সুগন্ধ মসলাযুক্ত তাম্বুল দিলেন। ঘিয়াস হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সভাস্থ সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এটি আমার নয়নানন্দরূপিণী কুমারী কন্যা,—মেহেরল্‌নেসা।"

আমীর-ওমরাহগণ সকলেই এক বাক্যে মেহে-রের অলোকসামান্য রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেলিম এতক্ষণ অবধি একটিও কথা কহেন নাই,—কেবল এক দৃষ্টে মেহেরের পানে চাহিয়া আছেন। ঘিয়াস, কন্যাকে ভাবী বাদসাহের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, এটি আমার কন্যা মেহেরল্‌নেসা—আপনাকে অভি-বাদন করিতে অসিয়াছে।"

এখন মিয়াসের এই আদ্যারীতি নতজানু হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ করিতে ... তে মধুরস্বরে

এক সুপ্রশস্ত স্ব...

আসীন হইয়াছেন, এ বাঁদী আপন... কুর্নিশ করি-

আলোকমালা জাঁহাপনার আগমনে, আ... আমাদের

গরের ... বিত্র হইল।"

...রা মনে মনে কহিলেন, "এই ভারতের ভাবী

...ক সম্রাট? ইনি যুবরাজ সেলিম?—আবার কেন

বুকের ভিতর তরঙ্গ উঠে? ভারতসাম্রাজ্য? রত্ন-

সিংহাসন?—থাক্, ও কথা মনে করিব না,—

বিধাতার মনে যা আছে, হইবে।"

সেলিম যথারীতি রাজ-কায়দা দেখাইয়া স্মিত-মুখে কহিলেন, "সুন্দরি! তোমাদের সৌজন্যে ও শিষ্টাচারে আমি পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই গুণেই তোমার মহানুভব পিতা দিল্লীশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র।—তোমাদের মঙ্গল হউক।"

"ভারতের ভাবী ভাগ্য-বিধাতার মুখে এই আশীর্ব্বচন আমাদের বহু পুণ্যফল।"

মেহের এই কথা বলিয়া স্বহস্তে এক স্ফটিক-পাত্রে কিঞ্চিৎ সুরা ঢালিলেন। সে সুরা অতি

সুস্বাদু ও সদ্‌গন্ধযুক্ত। তাহা সেলিং কবিগণের রাখিয়া তাঁহার সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন পায়ই

সেলিম বহুক্ষণ হইতে আকণ্ঠ ভরিয়া,—মেহেরের অপরূপ রূপ-সুধা পান করিতেছিলেন। এক্ষণে সেই মেহের-প্রদত্ত সুবাসিত সুস্বাদু সুরা-টুকুও সুধাবোধে পান করিলেন। পান করিবার সময় তিনি একবার তীব্রদৃষ্টিতে মেহেরের পানে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু হায়, চারি চক্ষের পূর্ণ মিলন হইতে না-হইতে, কি জানি কেন, মেহের ইচ্ছা করিয়া আপন চক্ষু দুইটি ভূমিপানে ন্যস্ত করিলেন। ইহাতে বুঝি সেই রূপের সুরা অধিক-তর মাদকতাময় হইল। সেলিম এই সুরাপানের পর হইতে, মেহেরকে যেন আরও অধিকতর সুন্দরী দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল, এ অপরূপ রূপ যেন এ মর্ত্তের নহে,—আসমান্ হইতে কোন পরী আসিয়া তাঁহাকে ছলনা করি-তেছে। সুরার নেশা ক্রমে তাঁহার জমিয়া আসিল; মস্তক ঈষৎ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল; মনে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ফুটিয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ জড়িতস্বরে মেহেরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—

গাও সুন্দরি,—একটি গান গাও ;—
র সঙ্গে সঙ্গে একটু নৃত্য করিয়াও তোমার
কলা-বিদ্যার সম্যক্ পরিচয় দাও।"

তখন সেই বিবিধ মণি-মাণিক্য-রত্নালঙ্কার-ভূষিতা,—উজ্জ্বল মনোহর পরিচ্ছদ-পরিহিতা,—চরণে অলক্তক-রাগ-রঞ্জিতা ও মধুর মঞ্জুর নিনাদিতা,—সেই পরম লাবণ্যবতী ষোড়শী সুন্দরী সভাস্থল আলোকিত করিয়া, দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণে আনন্দধারা ঢালিয়া দিয়া, চারিদিক্ মাতাইয়া, মধুর উচ্চকণ্ঠে এক গান ধরিলেন। গানের প্রতি স্বরগ্রামে, প্রত্যেক মিলন-তানে সুধাবর্ষণ হইতে লাগিল। কোকিলের পঞ্চমস্বরকেও পরাজিত করিয়া মেহেরের গলা উঠিল। সে কম্পিত উচ্চ কণ্ঠ, সে স্বর-মাধুর্য্য, সে শব্দ-উচ্চারণ ভঙ্গী, সকলের প্রাণ আর্দ্র করিল ;—অতীতের অনেক কথা জাগাইয়া দিল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির ও স্তব্ধ হইয়া একাগ্রমনে সেই গান শুনিতে লাগিল। ভাববিহ্বলা গায়িকার সেই অপূর্ব্ব মাধুরিময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের মনে হইল, যেন সেই সভাস্থলে মূর্ত্তিমতী রাগিণীর আবির্ভাব হইয়াছে।

প্রেমময়ী মেহের চিরদিন বৈষ্ণব কবিগণের প্রেম-গাথার পক্ষপাতিনী। অন্যগান তিনি প্রায়ই গায়িতেন না,—গায়িতে ভালবাসিতেন না। শিক্ষক সুরনাথের নিকট তিনি বিশেষ যত্নে ও ঐকান্তিক অনুরাগে, ঐ সব প্রেম-গাথা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ভাবুক সুরনাথও উপযুক্ত শিষ্যা পাইয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে, বৈষ্ণব-কবির অমৃতময় পদাবলী শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার ফলে, উভয়ের মনের মধ্যে যে ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রূপের জীবন্ত প্রতিমা মেহের, যবনী হইয়াও, সেই অনন্ত রূপময় রাসেশ্বরের আংশিক সত্ত্বা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ সকলের মূল,—তাঁহার সেই শৈশব-শিক্ষক, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুরনাথ। সুরনাথের মধুর স্বপ্নময়ী স্মৃতি,—মেহেরের হৃদয়ে আজীবন জড়িত ছিল। মেহের যখনই কোন বৈষ্ণব-কবির প্রেম-গাথা গান করিতেন, তখনই সর্ব্বাগ্রে ভক্তিভরে সুরনাথের সেই বিষাদমাখা, চিন্তাগম্ভীরা মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন। আজও সেই শৈশব-শিক্ষক, প্রেমের প্রথম পথ-প্রদর্শককে স্মরণ করিয়া তিনি গান ধরিলেন,—

"নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী-পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম-বিভোর॥
নবীন রসাল মুকুল মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উনমাতই
নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥"

গান শুনিতে শুনিতে, সকলের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সকলে শতমুখে মেহেরের গুণগান করিলেন।

হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে সেলিম মেহেরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি, ধন্য তোমার সঙ্গীত-শিক্ষা! আর একটি গান শুনাইয়া সকলকে

পরিতৃপ্ত কর।—কাফেরের গান দেখিতেছি তোমার বড় ভাল লাগে। ভাল, তাই গাও। জানি না, তোমার কণ্ঠে কি সুধা আছে,—তাহাতে তুমি যা গায়িবে, তাই ভাল লাগে। তোমায় বাধা দিব না, যে গানে তোমার অভিরুচি,—তুমি তাহাই গাও।"

মেহের গায়িলেন,—

"দেখবি সখি, 　　　শ্যাম চান্দ,
ইন্দুবদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র, 　　　যুবতী বৃন্দ,
গাওয়ে রাগ মালিকা॥
মন্দ পবন, 　　　কুঞ্জ ভবন,
কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন রাজ 　　　নব সমাজ
ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥
তরল তাল, 　　　গতি দুলাল
নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণনাথ, 　　　করত হাত,
রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গে অঙ্গে, 　　　পরশে ভোর,
কেহু রহত কাহুক কোর।
জ্ঞানদাস, 　　　কহত রাস,
যৈছন জলদে বিজুরী জোর॥"

এবার সেলিম স্বহস্তে সেতার লইলেন। আবেশে স্ফটিকপাত্রে স্বহস্তে সুরা ঢালিলেন। সেই সুরা পান করিয়া ঈষৎ জড়িতস্বরে কহিলেন,

"সুন্দরি, তোমার মেহেরেল্‌নেসা নাম সার্থক; সত্যই তুমি রূপেগুণে অতুলনীয়া! এইবার সুন্দরি, তুমি গানের সহিত নৃত্য-নৈপুণ্য দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত কর। আমি নিজে সেতার আলাপ করিতেছি।"

সুস্বর স্বর-লহরীতে সেতার বাজিতে লাগিল। সেতারের সেই মধুর ঝঙ্কারের সহিত সেই ষোড়শী সুন্দরীর মধুর নৃত্য আরম্ভ হইল। সে নৃত্যে সুন্দরীর সেই গোলাপ-তুল্য ফুল্ল অধর ঈষৎ কম্পিত হইল, মুখে সলজ্জ হাস্য-রেখা দেখা দিল, চরণ-নূপুর মধুর বাজিল, ক্ষীণ কটিতট অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দুলিল, বক্ষের বসন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল,—সে উদ্দীপ্ত রূপশ্রী অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সুন্দরী নৃত্য আরম্ভ করিলেন,—সেই সঙ্গে তাঁহার কর্ণ-আভরণ দুলিল, তাঁহার বিবিধ কারুকার্য্যখচিত মণিমুক্তাঝলসিত উত্তরীয় উড়িল, বিলম্বিত বেণী ফণিনীর ন্যায়

পৃষ্ঠে দলমল করিল,—মেহেরের সেই ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি,—জীবন্ত চিত্রের স্থায় প্রতীয়মান হইল।

সেলিম তখন একেবারে বাহ্যজগৎ ভুলিয়া অন্তর্জ্জগতে নিমগ্ন হইলেন। সুরার নেশার সহিত রূপের নেশা মিশিয়া তাঁহার মনের ভিতরটা সব গোলমাল করিয়া দিল। আজ যাহা দেখিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের চির-আরাধ্য বস্তু হইয়া রহিল।—সাম্রাজ্যের বিনিময়েও তিনি তাহা ভুলিতে পারিবেন না।

আবার যখন সেই আদর্শ রূপসী দেশকালপাত্র ভুলিয়া, ভাবাবেশে তন্ময়ী হইয়া, সেই মধুর নৃত্যের সহিত মধুর গান ধরিলেন, তখন যেন চারিদিকে সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল;—ধরাতলে এককালে যেন শতচন্দ্রের উদয় হইল;—সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেলিম তখন সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা, বিহ্বল, তন্ময়চিত্ত। যাই হোক, অনেক কষ্টে তিনি ধৈর্য্যধারণ করিলেন এবং একান্তমনে এই রমণী-রত্নলাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নৃত্যশীলা মেহের গায়িলেন,—

"ফুটল কুসুম নব, কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হেম- শিখরে সিধায়ল
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥
চান্দ-চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ
জানমু বিহি প্রতিকূল॥"

কখন বা গানের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য, কখন বা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুধাস্রাবী গান,—অসামান্য শিক্ষাকৌশলে সেই কলাবিদ্যা-পারদর্শিনী, — অলৌকিক রূপ-প্রভাশালিনী মেহের সভাস্থল চমৎকৃত করিয়া রাখিলেন। সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ, তাঁহার অলৌকিক রূপের অধিক প্রশংসা করিবেন, কি তাঁহার এই অসাধারণ কলাবিদ্যার অধিক প্রশংসা করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

নৃত্যশীলা মনোমোহিনী গাহিতে লাগিলেন ;—

"অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয়ে নয়ান।

এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত॥"

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ উত্থিত করিয়া,—অতীত ও বর্ত্তমানের সুখদুঃখের অনেক ছবি জাগাইয়া দিয়া, মেহের সঙ্গীত সমাপ্ত করিলেন। গীত ও নৃত্যের অবতারণায় তিনি কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ফুল্ল শতদল তুল্য নির্ম্মল মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভা পাইতে লাগিল। তিনি সখিগণ সমভিব্যাহারে একটি স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল। যুবরাজ সেলিম হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে আবেগভরে কহিলেন,

"সুন্দরি, সৌভাগ্য-ক্রোড়ে পালিত হইয়া জীবনে অনেক দেখিয়াছি, অনেক দেখিতেছি,—কিন্তু আজ যেমনটি দেখিলাম, এমন আর কখন

দেখি নাই, বোধ হয় দেখিবও না। একাধারে দুই বস্তু সংসারে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না,—আজ তোমাতে তাহা দেখিলাম। সত্য বলিতেছি, তোমার তুল্য রূপবতী ও গুণবতী রমণী,—শুধু এ রাজধানীতে কেন,—সমগ্র হিন্দুস্থানেও নাই। অন্ততঃ আমার তাহা অবিদিত। সত্যই তুমি রমণী-রত্ন।—কিন্তু রাজ-অন্তঃপুর ভিন্ন এ রত্ন অন্যত্র শোভা পায় না। বিজন অরণ্যে মন্দার-কুসুম ফুটিলে কে সে ফুলের সৌরভ লয়?"

মেহের মস্তক অবনত করিলেন। লজ্জা-বনতমুখী হইয়া কহিলেন, "যুবরাজের এ উচ্চ প্রশংসাবাদের অধিকারিণী,—এ বাঁদী নহে। যাই হোক্, আপনি যে নিজগুণে এ গরীবখানায় আতিথ্য-গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।"

"কিঞ্চিৎ পরিমাণ? না সুন্দরি, তা নয়। সম্রাট-পুত্র কখন বাহুল্যবর্ণনায় অন্যের মন রক্ষা করে না। আজিকার মত পূর্ণ তৃপ্তিলাভ,—কি আর বলিব সুন্দরী,—যদি খোদা কখন দিন দেন,

ত একথা বুঝাইব। সত্যই তুমি অতুলনীয়া। অথবা তোমার তুলনা—তুমি! তুমি যার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে, সে মহা ভাগ্যবান্।"

বুদ্ধিমতী মেহের দেখিলেন, কথায় কথা বাড়িবে ;—এ রূপোন্মত্ত হৃদয়কে বিশ্বাস নাই,—এখন এস্থান হইতে সরিয়া পড়াই বিধেয়।

তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "যদি যুবরাজের অনুমতি হয়, ত বাঁদী অন্তঃপুর গমন করে।"

"যাবে,—যাও, কিন্তু দুনিয়ার মালিক বাদসাহ-পুত্রকে স্মরণ রাখিও।"

স্মিতমুখী চন্দ্রাননী মুখ নত করিয়া কহিলেন, "যুবরাজের উদারতা ও অনুগ্রহ,—বাঁদীর কলিজায় গাঁথা থাকিবে।"

মেহেরল্‌নেসা সখিগণ সহ সেলিমকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিকট বিদায় লইয়া, গজেন্দ্রগমনে প্রস্থান করিলেন।

সেলিম হৃদয়-বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, এবার একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,

"আজ যাহা দেখিলাম, সত্যই তাহা অপূর্ব্ব।"

"সত্যই অপূর্ব্ব"—সমবেত সভ্যমণ্ডলী সমস্বরে যুবরাজের কথা অনুমোদন করিলেন।

যাইতে যাইতে মেহের মৃদুচ্চস্বরে এক সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সত্যই কি আমি এত সুন্দর?"

সঙ্গিনী একটু স্তব্ধ থাকিয়া উত্তর দিল, "তুমি এত সুন্দর যে, পৃথিবী খুঁজিয়া তোমার সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে হয়।"

কিন্তু সেই সময় কে একজন তাঁহাদের পার্শ্ব হইতে নহয়া উত্তর করিল, "তুমি এত সুন্দর যে, স্বয়ং সৌন্দর্য্য আসিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ে!"

মেহের সচকিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, এক তপ্তকাঞ্চননিভ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ স্মিতাননে তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন।

উভয়ের চারি চক্ষুর মিলন হইল। লহমার দর্শনে উভয়ের যুগ যুগান্তরের সুখ-স্বপ্ন জাগিয়া উঠিল। মনে মনে উভয়েই উভয়কে আত্মদান করিলেন।

নীরবে এই অপূর্ব্ব অভিনয় হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এখন এই বাৎসরিক নিশি-ভোজ উপলক্ষে, মেহেরের জীবন-নাটকে যে সমস্যাপূর্ণ মহা-অঙ্কের অভিনয় হইয়া গেল, এইবার তাহা বলিব।

যুবরাজ সেলিম মেহেরকে দেখিয়া যেরূপ ইন্দ্রিয়াধীন হইয়াছেন, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে, পাঠক তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছেন। ফলতঃ মেহেরের সেই উদ্দীপ্ত রূপশ্রী,—সেলিমের হৃদয়ে বিশেষরূপ আধিপত্য স্থাপন করিল। মেহেরের সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি,—সেলিম সাধ করিয়া অহর্নিশ হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিলেন। অথবা সে মূর্ত্তি, মুহূর্ত্তকাল বিস্মৃত হইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। মেহেরের সেই কৌমুদীনিন্দিত বর্ণ, সেই অপরূপ মুখ-চন্দ্রমা, সেই আকর্ণ-বিস্তৃত

বিশাল চক্ষু, বিম্বাধরে সেই স্বাভাবিক স্মিত-সেই মধুর হাবভাব পূর্ণ বিলোল কটাক্ষ, সেই যৌবনসুলভ পরিপূর্ণ অবয়ব, সেই ক্ষীণ কটিতট,—সেলিমের হৃদয়-সমুদ্র আলোড়িত করিতে লাগিল। এই দৈহিক সৌন্দর্য্যসমষ্টির উপর আবার সেই আভ্যন্তরীণ অনাবিল সৌন্দর্য্যরাশি,—সেই সুস্বর স্বর-সঙ্গীত সেই মনোমুগ্ধকর নৃত্য,—সেই সুকুমার কাব্যানুশীলন!—ভাবিতে ভাবিতে সেলিম আত্মহারা, বিবশ, বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মেহের তাঁহার ধ্যান জ্ঞান আরাধ্য বস্তু হইল। সে মোহিনী প্রতিমা বুক চিরিয়া তাঁহার বুকে বসিল। সেলিম অহর্নিশ মেহেরের রূপ-রশ্মিতে পুড়িতে লাগিলেন।

মনের এই অবস্থায় সেলিমের একমাত্র চিন্তা হইল,—যে কোন উপায়ে হউক, এই ললনা-রত্ন লাভ করিতে হইবে। রূপের জন্য তিনি আভিজাত্য, বংশমর্য্যাদা, মান, সম্ভ্রম, পদ,—সকলই বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

মনে বড় আশা লইয়া, মুখ ফুটিয়া তিনি ঘিয়াসকে সকল কথা বলিলেন। বলিলেন,

তোমার কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ দাও,—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার কন্যাই আমার হৃদয়-রাজ্যের ঈশ্বরী হইবেন। আরও বলিতেছি, আমার পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্তির পর, তোমার কন্যাই প্রকৃত প্রস্তাবে, ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন। বেগম-মহলে তাঁহার স্থান সকলের উচ্চে থাকিবে।”

চক্ষের নিমিষে ঘিয়াসের হৃদয়ে অতীতের ইতিহাস আদ্যোপান্ত জাগিয়া উঠিল। সেই বিজন মরুভূমি, সেই আমিনা, সেই মেহেরন্নেসার জন্ম, সেই পরিত্যক্তা মেহেরের মস্তকোপরি কালসর্পের ফণা বিস্তার করিয়া 'রাজছত্র' ধারণ,—মুহূর্ত্তমধ্যে অতীতের আদ্যন্ত চিত্র ঘিয়াস দেখিয়া লই-লেন। ইতিপূর্ব্বে এক জ্যোতিষীও মেহের সম্বন্ধে এইরূপ গণনা করিয়াছিল। সযত্নে লুক্কায়িত উচ্চাভিলাষ সহসা ঘিয়াসের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সহসা আবার কি ভাবিয়া তিনি শিহরিলেন। মনে মনে কহিলেন, “থাক্, দুরাকাঙ্ক্ষার দাস হইব না। নরকের প্রেত মানব-পতঙ্গের সম্মুখে এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষার আগুন ছড়াইয়া দেয় বটে!”

প্রকাশ্যে বলিলেন,"হুজুরের এ প্রস্তাব, নফরের পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও, আমি এখনই এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিতেছি না। যুবরাজ, ভৃত্যের গোস্তাকি মাপ করিবেন,—স্বয়ং দিল্লীশ্বরের অভিমতি না হইলে, কার গর্দ্দানে এমন জোড়া-মাথা আছে যে, এ কথার উত্তর দিতে সাহসী হয়!"

"হাঁ, বুঝিয়াছি, প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ বলিয়া, ভাবী ভারত-সম্রাটকে কন্যাদান করিবার অভিলাষ প্রকাশেও তুমি ভীত হইতেছ। আচ্ছা, এ বিষয় আমি স্বয়ং পিতার নিকট প্রস্তাব করিব।—তিনি সম্মত হইলে ত তোমার কোন আপত্তি থাকিবে না?"

"এমন মূর্খ কে আছে যে, দুনিয়ার মালিককে কন্যাদান করিতে আপত্তি করে? সাধ করিয়া কে সাধনার ধনকে প্রত্যাখ্যান করে?"

"তবু বলি,—সময়গুণে এমনও হয়। গ্রহচক্রে পড়িয়া, লোকে অমূল্য রত্নও জলে ফেলিয়া দেয়।"

"সে বিষয়ে যুবরাজ নিঃসন্দেহ থাকুন।"

সেলিম প্রস্থান করিলেন। ঘিয়াস ভাবিতে লাগিলেন, "এ, কি এ! স্বপ্ন, না সয়তানের ছলনা? অথবা সেই মরুভূমে হ্রদ-দর্শনের ন্যায় এও কোন প্রহেলিকা? যুবরাজ সেলিম—ভাবী ভারত-সম্রাট আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চান? স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ বিষয় তিনি আমাকে অনুরোধ করেন? আমার কন্যা,—ওঃ! সেই মরুভূমে অনশনে প্রাণত্যাগকারিণী দুঃখিনী আমিনার স্নেহের নিধি রাজরাজেশ্বরী হইবে? স্বপ্ন, তুমি কি এত আশ্চর্য্য? সত্য অপেক্ষাও তুমি প্রহেলিকাময়? না, না, নিশ্চয় এ দুরাকাঙ্ক্ষার আপাত-মনোহর ছায়া! যুবরাজ আমাকে ছলিতে আসিয়াছিলেন!—ছলিতে আসিয়াছিলেন? ছলনার জন্যই কি তবে তিনি ভৃত্যের আবাসে আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলেন?"

ঘিয়াস নিবিষ্টমনে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। পরে আপনা আপনি বলিলেন,

"না, তাই বা কি? এরূপ বিস্মিত হইবার কারণ ত কিছু দেখি না? এ দুনিয়ায় কে রাজা, কে প্রজা? রাজারও ত রাজা আছে,—সেই

রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা।—আমরা সচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য রাজা প্রজা একটা গড়িয়া লই মাত্র। তবে, কে কার প্রভু, আর কে কার ভৃত্য? প্রভু ভৃত্যও একটা লৌকিক সম্বন্ধ।—সৌন্দর্য্যের চরণে চরাচর বিশ্ব বিলুণ্ঠিত হয়; অতএব সৌন্দর্য্যই সকলের সার।—আমার কন্যা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অধীশ্বরী,—পার্থিব সম্পদের অধীশ্বর সেলিম তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? রূপের নিকট কে না পরাভব স্বীকার করে? মেহেরন্নেসা আমার অলৌকিক রূপবতী; সে রূপে সেলিম-পতঙ্গ পুড়িয়া মরিবে, ইহা আর একটা কি বিশেষ কথা? যার আমার সে সৌন্দর্য্যশালিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিলে,—শত সেলিম,—শত সম্রাট তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইবে! ইহাই স্বাভাবিক।—ওহো আমিনা! আমার জন্মজন্মান্তরের সুখস্মৃতি! এসময় তুমি কোথায় রহিলে?”

চক্ষের জলে ঘিয়াসের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। তিনি অন্তরের অন্তরে প্রিয়তমার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, সেই শোকমাধুর্য্যময়ী স্মৃতি পূজা করিতে

লাগিলেন। বুঝিলেন, বিরলে চক্ষের জলে হৃদয়-তল ধৌত করিয়া যে নির্ম্মল সুখ লাভ হয়, কোলাহলময় সংসারের শত আড়ম্বরের মধ্যে সে সুখ মিলে না।

ঘিয়াস গৃহে গেলেন। একাকী আপন কক্ষে বসিয়া মেহরলূনেসা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ অনেক কথা ভাবিলেন। মনে মনে বলিলেন,

"মেহের বিবাহযোগ্যা হইয়াছে;—আর তাহাকে অনূঢ়া রাখা কর্ত্তব্য নয়। এ রাজধানীর উজীর ওমরাহ প্রভৃতি শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মেহেরের পাণিগ্রহণাভিলাষে উৎসুক;—কাহাকে বঞ্চিত করিয়া কাহাকে কন্যা-রত্ন দান করি? কন্যার বিবাহ বিষয়ে পিতার অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; অতএব আমি যাহাকে ইচ্ছা, কন্যাদান করিব। কিন্তু কন্যার মনোনয়ন বিষয়েও একটু লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। কথাপ্রসঙ্গে মেহেরের সঙ্গিনীর মুখে আভাষ পাইয়াছি, ওমরাহ-শ্রেষ্ঠ সের আফ্‌গানকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিলে মেহের সুখী হয়।—কথাটা কি ঠিক্? যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে আমার কন্যার উপযুক্ত মনোনয়ন

হইয়াছে। সের আফগান বীর, ধীর ও উদারচেতা ; তিনি রূপবান্, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ;—অধিকন্তু সর্ব্বত্র সম্ভ্রান্ত ও সম্পূজিত ;—এরূপ পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান শ্লাঘনীয়, সন্দেহ নাই। আমার কন্যা বীর-পত্নী হইবারই উপযুক্ত।—সেলিম ?—ছার ভারত-রাজ্য! গুণের তুলনায় সেলিম অপেক্ষা সের আফ্‌গান বহুগুণে গরীয়ান্।”

এই সময়ে মেহেরল্‌নেসার এক সঙ্গিনী সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। ঘিয়াসকে অভিবাদন করিয়া বলিল,

“ওমরাহশ্রেষ্ঠ সের আফগানের নিকট হইতে এক বাঁদী, প্রিয়সখীর সম্মানার্থ,—কিছু উপঢৌকন লইয়া আসিয়াছে ;—গ্রহণ করিব কি ?”

ঘিয়াস একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “লইতে পার।”

মেহের-সঙ্গিনী চলিয়া যাইতেছিল· ঘিয়াস ডাকিলেন, “মনিয়া।”

মনিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। ঘিয়াস বলিলেন,

“মনিয়া, সেদিন ভোজ-রাত্রে সের আফ-

গানের সহিত তোমাদের প্রথম কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?”

“যখন আমরা সভামণ্ডপ হইতে অন্তঃপুরে চলিয়া আসিতেছিলাম, সেই সময় তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পাই। শুনিলাম, স্থানান্তরে গিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল।”

“তিনি যে মেহেরের পাণিগ্রহণে অভিলাষী, তুমি কিরূপে বুঝিতে পারিলে ?”

“তাঁহার একটি মাত্র কথায় ও আকার-ইঙ্গিতে।”

এই বলিয়া মনিয়া সংক্ষেপে অথচ সুকৌশলে সেরআফগান ও মেহেরের—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ বুঝাইয়া দিল। বুঝাইয়া দিল যে, প্রকৃত অনুরাগ বা প্রেম বহু আড়ম্বরে কিংবা বহু বক্তৃতা-কৌশলে হয় না,—তাহা একবার মাত্র চোকের দেখায় ও সামান্য দুই একটি মাত্র কথায় বা ঘটনায় জন্মিয়া যায়। তবে নায়ক নায়িকার গুণগ্রাম, লোকমুখে শুনিতে শুনিতে পরস্পরের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা বা ভালবাসা জন্মিয়া থাকেও বটে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। সের আফ-

গানের বহু গুণগ্রামের কথা লোকমুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তিনি যেমন যোগ্য-পাত্র, মেহেরল্‌-নেসাও তেমনি রমণীরত্ন। রত্ন না হইলে রত্নের মর্য্যাদা বুঝিবে কে? তাই সের আফগান মেহে-রের অনুরাগী হইয়াছে, এবং মেহেরও সের আফগানের পক্ষপাতিনী হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, মনিয়া নাম্নী এই সহচরী সের আফগানকে চিনিত। সেই-ই এই প্রণয়-ব্যাপারে একরূপ দূতিগিরি করিয়াছে।

ঘিয়াস সমস্তই বুঝিলেন। তথাপি সের আফগানের প্রতি, কন্যার আনুরক্তির বিশিষ্ট প্রমাণ পাইবার জন্য বলিলেন, "ভাল বুঝিলাম, সের আফগানই যেন মেহেরকে ভালবাসিয়াছেন, কিন্তু মেহের যে সের আফগানের সম্পূর্ণ পক্ষ-পাতিনী, তাহার প্রমাণ কি?—মেহের কি তোমা-দিগকে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে?"

এবার মনিয়া বিষম জেরায় পড়িল। মনে মনে বলিল, "আর লজ্জা কি? দু' দিন পরেই ত সব প্রকাশ হইবে?" প্রকাশ্যে কহিল,

"একরূপ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন বৈকি?

সে দিন নৃত্য গীত অবসানে যখন নিমন্ত্রিতগণ আহারে বসিলেন, তখন আমি প্রিয়সখীর মন-পরীক্ষার জন্য স্পষ্টতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—'সব দিক বিচার করিয়া দেখিলে, সেলিম ও সের আফগান—এ দুয়ের মধ্যে তোমার বিবেচনায়, কে বড় ?' প্রিয়সখী এতটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন,—'সের আফগান।' তখন দুনিয়া (অন্যতম সখী) হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আচ্ছা, সেলিম ও সের আফগানের মধ্যে কাহাকে পতিরূপে পাইলে তুমি অধিক সুখী হও।' প্রিয়-সখী তখন গর্ব্বিতা কেশরীর ন্যায় শির উত্তোলন করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন, "দুনিয়া, এত-দিন একসঙ্গে থাকিয়া, তোমরা কি আজিও আমাকে চিন নাই ? বীরেন্দ্রাণী হওয়া অপেক্ষা কি ভোগবিলাসবতী হওয়া শ্লাঘনীয় ? দিল্লীর কোষাগারে জগতের সকল ঐশ্বর্য্য থাকিতে পারে বটে ; কিন্তু রমণীর যাহা প্রাণের স্পৃহনীয়, তাহা সেখানে নাই,—তাহা উদ্যমশীল পুরুষসিংহের গৃহেই সম্ভবে। সেলিম ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইতে পারেন, কিন্তু নরনারীর হৃদয়-

রাজ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা নাই ;—বীরাগ্রগণ্য মহানুভব সের আফগান, ধনবান্ না হইয়াও, হৃদয়গুণে সমগ্র নরনারীর প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার পান।—যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, ত আমি সেলিমকে চাহি না,—সের আফগান্‌কে চাই।”—প্রিয়সখীর সে তেজস্বিনী উক্তি ও মহামহিমময়ী মূর্ত্তি এখনও আমার মনে জাগিয়া আছে।”

“আমারই কন্যার যোগ্য উক্তি বটে !”

হর্ষ-গর্ব্ব-উত্তেজনা-মিশ্রিতস্বরে এই কথা বলিয়া, ঘিয়াস সেই দুহিতা-সহচরীকে বলিলেন, “যাও, তুমি এখনই গিয়া সের আফগান্-প্রদত্ত উপহার সাদরে গ্রহণ কর। আর মেহেরকে বলিও, মেহেরও যেন এতদুপযুক্ত প্রত্যুপহার কল্যই সের আফগানকে পাঠাইয়া দেয়।”

মনিয়া প্রস্থান করিল। ঘিয়াস আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—

“আমার কন্যার যোগ্যই উক্তি বটে ! সত্য,—ধন-দৌলৎ মানুষকে সুখী করিতে পারে না,—যদি তাহার মূলে কোন খাঁটী জিনিস না থাকে। রাজা-রাজড়ার মধ্যে ঐ খাঁটী জিনিসটার বড়ই

অভাব। মণিমুক্তা-হীরা-জহর লইয়া খোলার-কুচির মত তারা দুই হাতে ছড়াইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক, তাহাদের বড় কম। যে ধন-কুবেরের ইহা আছে, সে প্রকৃতই ভাগ্যবান্। দুঃখের বিষয়, সংসারে এ দৃশ্য অতি বিরল। সত্য, নামে রাজরাজেশ্বরী হইয়া খেলনার পুত্তলি হওয়া অপেক্ষা,প্রকৃত বীরেন্দ্রাণী আদরিণী ঘরণী হইয়া মনের সুখে থাকা,সহস্রগুণে শ্লাঘনীয়। সেলিম মাথায় থাকুন, সের আফগানকে কন্যাদান করিতে পারিলে আমিও সমধিক সুখী হই। মেহের ঠিকই বুঝিয়াছে,—অতুল ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মনুষ্যত্ব অনেক বড়।"

মেহেরের অদৃষ্ট-চক্র যে দিকে ঘুরিল, ঘিয়াস তাহার অনুকূলেই রহিলেন। চক্রের ঘূর্ণনের সহিত মানুষের মনবুদ্ধি সকলই ঘুরিতে থাকে।—মানুষ ক্রীড়নক মাত্র।

সেই ভোজ-সভায় মেহের ও সের আফগানের সেই একবার মাত্র শুভদৃষ্টি,—পরস্পরের বাঞ্ছিতকে চিনিয়া লইল। অনেক দিন ধরিয়া সমগ্র সংসার দেখিয়া, দুইজনে যাহা খুঁজিয়া পায়,

নাই,—মুহূর্ত্তের দর্শনে, ভাবের মিলনে তাহাই আজ মিলিল। জীবনের দুই একটা গুরুতর সমস্যা এই ভাবেই পূর্ণ হয়। ইহাকে আকর্ষণী শক্তি বল, স্বভাবের গতি বল, আর অঘটন ঘটন পটীয়সী বিধাতার ইচ্ছাই বল,—মূল কথা, এমনই একটা কিছু হইয়া থাকে।—ইহাই জীবনের মাহেন্দ্র-যোগ।

এই মাহেন্দ্র-যোগেই নায়ক নায়িকার শুভ সন্দর্শন হইয়াছিল; তাই বিনাচেষ্টায় উভয়েই উভয়কে পাইলেন। তাই, দূর হইতে মেহেরল্-নেসাকে সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া সের আফগান মন্ত্রমুগ্ধবৎ অমিনেষ নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; এবং তাই সখীর কথা শেষ হইতে-না-হইতে মেহেরকে উদ্দেশ করিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তুমি এত সুন্দর যে, স্বয়ং সৌন্দর্য্য আসিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ে!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রূপোন্মত্ত সেলিম পিতার নিকট গিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। খিয়াস-দুহিতা—অসামান্য সুন্দরী মেহেরল্‌নেসা যে, তাঁহার চিত্তহরণ করিয়াছে, প্রকারান্তরে তাহা বলিলেন। বলিলেন, সে রমণী-রত্ন না পাইলে, তাঁহার জীবন ভারবহ বোধ হইবে।

আকবর পুত্রের মনোবিকার বুঝিলেন। কিন্তু অন্যায় স্নেহে বা অসম আব্‌দারে অভিভূত হই-বার লোক তিনি নহেন। সেরূপ ধাতুতে তাঁহার হৃদয় গঠিত নয়।—তিনি অম্লানবদনে, অবিচলিত-ভাবে,—অধিকন্তু কিছু বিরক্তির সহিত এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

সেলিমের বড় আশায় ছাই পড়িল। বুঝিলেন,

পিতা বর্ত্তমানে তাঁহার মন-সাধ মিটিবে না ;—উপস্থিত মনের ক্ষোভ মনেই মারিতে হইবে।

সূক্ষ্মদর্শী আকবর ভাবিলেন, "যাই হোক, শীঘ্রই ঘিয়াস-দুহিতার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক হইতেছে। পুত্রের যাহার প্রতি লালসা পড়িয়াছে, তাহাকে নিরঙ্কুশ রাখা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস কি? এই কন্যা গৃহে আসিলে আমার কুল-মর্য্যাদা ক্ষয় হইবে।—ভৃত্য-কন্যা কি ভাবী ভারতেশ্বরী হইবার যোগ্যা? তার পর এক কথা ;—শুনিয়াছি, ঘিয়াসের এই কন্যা সত্য সত্যই পরমা সুন্দরী ;—এমত অবস্থায় সেলিম যদি ইহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে আমার কুললক্ষ্মী বধূমাতার দশা কি হইবে? কত সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চাল চালিয়া, হিন্দু-মুসলমানকে এক করিবার জন্য আমি মানসিংহের ভগিনীকে পুত্রবধূ করিয়াছি ;—ঘিয়াস-দুহিতা যদি সেলিমের বিবাহিতা বনিতা হয়, তাহা হইলে রূপাতুর সেলিম নিশ্চয়ই তাহার চরণে ভারত-সাম্রাজ্য অর্পণ করিবে,—আর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ,—সেই রাজপুত-কন্যা তাহার

বাঁদী হইয়া থাকিবে।—না, তা কিছুতেই হইবে না। ও কণ্টক শীঘ্রই দূর করা কর্ত্তব্য।”

আকবর্ তখনই ঘিয়াসকে আহ্বান করিলেন। ঘিয়াস আসিলে কৌশল করিয়া বুঝাইলেন, অবিলম্বে তাঁহার কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

এই সময়ে ভারত-সম্রাটের মনে হইল, তাঁহার একজন প্রধান অমাত্য আজিও অবিবাহিত;—সেই অমাত্যের সহিত ঘিয়াস-কন্যার বিবাহ দেওয়াইতে পারিলে, তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রথমতঃ, সেই অমাত্যটি আজীবন কৃতজ্ঞতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়; দ্বিতীয়তঃ, সেলিমের আর সেই কন্যার প্রতি লালসা থাকে না। সুতরাং সেই অমাত্যের সহিত ঘিয়াস-কন্যার বিবাহ দেওয়াই, সম্রাট যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন। এই অমাত্য অন্য কেহ নহে,—সেই সর্ব্বজন-প্রশংসিত—সাহসী, বীর, উদ্যমশীল পুরুষসিংহ সের্ আফ্গান্।

সের আফগানের বীরত্বে ও বাহুবলে সম্রাট বিশেষ সন্তুষ্ট। রাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ-বিগ্রহ কালে, এই সাহসী তুর্কী,—সেলিমকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আরও বহু গুণগ্রামে, সের সম্রাটের প্রিয় ছিলেন। গুণগ্রাহী আকবর এখন অবসর বুঝিয়া, সেই গুণের পুরস্কার স্বরূপ, ঘিয়াসের কন্যার সহিত সের আফগানের বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। এবং বিবাহের যৌতুব-স্বরূপ উপযুক্ত মনসব ও জায়গীর দিয়া, সের আফ্গানকে সংবর্দ্ধনা করিবেন, ইহাও স্থির করিলেন।

সম্রাট মনে মনে সমস্ত স্থির করিয়া ঘিয়াসকে বলিলেন, "তোমার কন্যা যেমন রূপবতী ও গুণবতী, সেইরূপ রূপবান্ এবং বহুগুণে গুণবান্ একটি পাত্র আমার হাতে আছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে সেই পাত্রে তুমি কন্যাসম্প্রদান করিতে পার।"

ঘিয়াস পরম সৌভাগ্য বোধে, বিনীত ভাবে পাত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্রাট বলিলেন,

"আমি সের আফগানকে উদ্দেশ করিয়া এ কথা বলিতেছি।—কেমন, এ পাত্র তোমার মনোনীত হয়?"

ম্মিয়াস সর্ব্বান্তঃকরণে, সসম্মানে সম্রাটের অভি-প্রায় অনুমোদন করিলেন। মনে মনে বলিলেন,

"জগদীশ্বর, ধন্য তোমার মহিমা! আমি আজ কিছুদিন হইতে অন্তরের অন্তরে যে ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছি, সম্রাটও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন। বুঝিলাম, সতী-সাধ্বী আমিনার পুণ্যে, মেহের আমার সৎপাত্রেই অর্পিত হইবে।"

সের আফগান সম্রাটসকাশে আহূত হইলেন। সহসা সভামাঝে যেন একটি পুষ্পপল্লবশোভিত মহামহীরুহের আবির্ভাব হইল। সের আফগানের সেই দীর্ঘ অবয়ব, উন্নত ললাট, বিশাল বক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু, প্রতিভাপূর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, তপ্তকাঞ্চননিভ তেজঃপুঞ্জ কলেবর,—সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সের সম্রাটসমীপে উপনীত হইয়া, যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া, স্বাভাবিক জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিলেন,

"জাঁহাপনা, অধীনকে কোন্ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আহ্বান করিয়াছেন? অনুমতি করুন, দাস রাজাজ্ঞা পালনে সদাই প্রস্তুত।"

যুদ্ধ-নি

সম্রাট কহিলেন, "সের, তোমার রাজভক্তি ও কার্য্যকুশলতা লোকপ্রসিদ্ধ,—তাহা আমি জানি। কিন্তু আজ তোমাকে সেজন্য আহ্বান করি নাই। আজ তোমায় এমন একটি অমূল্য রত্ন উপহার দিব,— আশা করি, যাহা তোমার জীবন চির-মধুময় করিয়া রাখিবে।—তুমি এই কোষাধ্যক্ষ ঘিয়াস বেগের কন্যাকে কখন দেখিয়াছ ?"

"হাঁ জাঁহাপনা, একদিন কয় মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

মনে মনে কহিলেন, "একি, এ প্রশ্ন কেন ?—হৃদয়. আশ্বস্ত হও ; কিছুক্ষণের জন্য ধৈর্য্য-ধারণ কর।"

সম্রাট। কেমন দেখিলে ?

সের। (স্বগত) কেমন দেখিলাম ?—কেমন করিয়া বুঝাইব. কেমন দেখিলাম ? যে বস্তু কেবলমাত্র অন্তরে অন্তরে অনুভব করা যায়, তাহার স্বরূপ অন্যেকে কি বুঝাইব ?—কেমন দেখিলাম ? স্বপ্নে যদি কেহ স্বর্গরাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, অলকার রত্নরাজি-পরিশোভিত, অপ্সরা-

নিন্দিত, ধাতার মানস-সৃষ্টি দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করে,—সে কি সে কথা অন্তকে বুঝাইতে পারে?—কেমন দেখিলাম? যাহা দেখিলে যুগযুগান্তরের সুখস্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়া হৃদয় আলোকিত করে; যে মুখ মনে হইলে, স্বর্গ না দেখিয়াও স্বর্গের কথা মনে পড়ে; যে দেহ-সুষমায় চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত বাসন্তী পূর্ণিমা-নিশিও ম্লানবোধ হয়;—কেমন করিয়া বুঝাইব, সে ললনা কেমন দেখিলাম?"

সেরকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া সম্রাট পুনরায় কহিলেন, "শুনিয়াছি, ঘিয়াস বেগের কন্যা পরমা সুন্দরী; রাজধানীর আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার রূপের প্রশংসা করে;—তুমি আজিও অবিবাহিত;—আমি মানস করিয়াছি যে, সেই কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিব।—তুমি ইহাতে সম্মত আছ?"

সের। (স্বগত) আ! আজ আমার সুপ্রভাত!

প্রকাশ্যে কহিলেন, "দিল্লীশ্বরের অভিপ্রায় জগদীশ্বরের আদেশ তুল্য প্রতিপালিত হইবে।—

এজন্য আর অধীনের মত-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? বরং আমি আপনাকে ভাগ্যবান্ বোধ করি যে, রাজস্বসচিব মহাশয় জাঁহাপনার সহিত একমত হইয়া, তাঁহার অনুপমা কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছেন।”

ঘিয়াস। আপনি মহাশয় ব্যক্তি; আপনাকে কন্যাদান আমারও সৌভাগ্যের কথা।

সম্রাট। সত্য।—সের, তোমার গুণ-গরিমা কাহারও অবিদিত নাই। সত্যই তুমি অতি যোগ্য পাত্র।

সের। জাঁহাপনা নিজ হৃদয়গুণেই গোলামকে স্নেহ-চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। অপূর্ব্ব সুন্দরী মেহেরল্‌নেসার সহিত তুর্কীবীর সের আফগানের বিবাহ-সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। সকলেই সেরের অদৃষ্টের ধন্যবাদ করিল। সমস্ত উজীর ওমরাহ ত দূরের কথা,—ভাবী ভারত-সম্রাটও যে ললনা-লাভে বঞ্চিত হইলেন, পরম সুকৃতিবলে সের আফগান সে রত্ন লাভ করিবেন।—এমন কি, স্বয়ং “দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা” ৫

বিবাহের একরূপ ঘটকালি করিলেন। সুতরাং সের আফগানের এতটা সৌভাগ্য কাহারও কাহারও ভাল লাগিল না। মুখে 'আহা মরি' করিলেও মনে মনে কেহ কেহ দুঃখিত হইলেন।

তা দুঃখিত হউন, আবালবৃদ্ধবনিতা যে বিষয়ে সুখী, সে বিষয়ে জগদীশ্বরের কৃপা-দৃষ্টি পড়ে।—সে বিষয় কখন অসম্পূর্ণ থাকে না। দুই দশজন অধমাত্মা ব্যতীত, সকলেই উৎসুক-চিত্তে শুভ-দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সে শুভদিন আসিল। চারিদিক্ উৎসব ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। মহাসমারোহে সের আফগান ও মেহরনুন্নেসার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

উদ্বাহ-সভায় স্বয়ং ভারত-সম্রাট উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই শুভ-মিলনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "যোগ্য পাত্রে যোগ্য পাত্রী অর্পিত হইয়াছে। হাঁ, ঘিয়াস-দুহিতা রূপসী বটে। সত্যই এ রূপ অতুল্য। বুঝিলাম, সেলিম এই রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল।"

সম্রাট বর-কন্যাকে প্রচুর যৌতুক দিলেন।

ঘিয়াস প্রাণের আশীর্ব্বাদ ও প্রীতিভরা রুদ্ধ অশ্রু-জল উপহার দিয়া বর-কন্যাকে গৃহে তুলিলেন। চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

পুর-মহিলাগণ বর-কন্যার অতুল রূপ-মাধুরী দেখিয়া, মণি-কাঞ্চন যোগ হইল ভাবিয়া, শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ঘিয়াস কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"মা, যে অমূল্য-রত্ন আজ তুমি লাভ করিলে, ইহলোকে রমণীর ইহাই একমাত্র সম্বল; পরলোকে ইহাই পাথেয়;—কথাটি চিরজীবন স্মরণ রাখিও।"

মেহের মনে মনে বলিলেন, "ইহলোকে ইহাই একমাত্র সম্বল, পরলোকে ইহাই পাথেয়।—পিতৃ-আশীর্ব্বাদ যেন সার্থক হয়।"

সের ভাবিতে লাগিলেন, "একি, প্রাণে আজ এ অপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাস হয় কেন? ইহারই নাম কি দাম্পত্য-প্রেম? এ যে কোন্ অদৃষ্টপূর্ব্ব শান্তি-রাজ্যে উপস্থিত হইতেছি! জীবনের চির দুর্ব্বহ-ভার,—প্রাণের অসীম শূন্যতা,—সহসা যে কোথায় অন্তর্হিত হইল!—জগদীশ্বর, এত সুখ অদৃষ্টে সহিবে ত?"

শুভ দাম্পত্য-মিলনে, এই মাঙ্গলিক কার্য্যে সকলেই সুখী হইল ; সকলেই অতুল আনন্দলাভ করিল ; কিন্তু একজনের মনে ভীষণ নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একজন অতি সযত্নে হিংসা-দানবকে হৃদয়ে স্থান দিল। সে একজন,—সেই প্রত্যাখ্যাত নিরাশ-প্রণয়ী সেলিম।—ভারতের ভাবী ভাগ্য-বিধাতা যুবরাজ সেলিম।

সেলিম অতি মর্ম্মান্তিকরূপে তাঁহার প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বীর চির-শত্রু হইয়া রহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভারতের ভাবী ভাগ্য-বিধাতা যাহার শত্রু, তাহার মনের অবস্থা কি, পাঠক সহজেই [illegible] করিতে পারেন। কিন্তু সের আফগান অগ্রে অত[illegible] [illegible] উঠেন নাই। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, যুব[illegible]রাজ সেলিম, [illegible] [illegible] মেহেরের রূপ-মোহে উন্মত্ত হইয়াছেন। বুঝেন নাই যে, বিবাহ-অন্তে সেলিম তাঁহার মহাবৈরী হইবেন। জানিতে পারেন নাই যে, ভিতরে ভিতরে সেলিম এক বিষম চক্রান্ত করিয়া তাঁহার জীবনের সুখশান্তি সমস্ত হরণ করিবেন।

যখন তাহার আভাস পাইলেন, তিনি বড়ই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। ভাবিলেন, "হায়, কি করিতে কি করিলাম? কাহার সহিত বিবাদে

প্রবৃত্ত হইলাম ? কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করিয়া জলে বাস করিব ? কুরঙ্গ হইয়া ক্রোধান্ধ সিংহের সহিত যুঝিব ?—কে জানিত, রূপবতী ভার্য্যাই আমার কাল-স্বরূপ হইবে ? কে বুঝিয়াছিল, মেহেরের রূপ-মাধুরী সেলিমকে পাগল করিবে ?

"কিন্তু যাই হোক্, যখন জগতের সার রত্ন লাভ করিয়াছি, তখন যত্ন করিয়া আজীবন সে রত্ন বক্ষে রাখিব ?—কে সেলিম ? কে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা ? বিষয়-কার্য্যে তিনি না হয় আমার প্রভু ; কিন্তু হৃদয়-রাজ্যে সেলিম আমার কে ? সেলিমও মানুষ, আমিও মানুষ ; তবে সেলিম-ভয়ে অযথা ভীত হইব কেন ? নীচাত্মা, হিংস্রক ও পরপীড়ন-কারী যে, তাহার মনের বল কতটুকু ? হউক না সে দিল্লীর সম্রাট ? হউক না সে ভারতের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা ? তাহার উপরও ত একজন সর্ব্ব-শক্তিমান্ ন্যায়বান্ রাজা আছেন ?—আমি সেই পৃথিবীর অধীশ্বরের ন্যায়-বিচারের উপর নির্ভর করিব ;—দেখি, ক্ষুদ্র সেলিম-কীটাণু আমায় কি করিতে পারে ?

"মেহেরকে আমি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কোরাণ

স্পর্শ করিয়া বিবাহ করিয়াছি ; মেহের আমার ধর্ম্মপত্নী ;—একটা স্বেচ্ছাচারী কাম-কুক্কুর আমার সে ধর্ম্মপত্নী উচ্ছিষ্ট করিবে ? তবে সৌর্য্যবীর্য্য-পরাক্রম কিজন্য ? তবে জীবনধারণ কিজন্য ? আমার প্রাণের জিনিস একজন বলে ছলে কৌশলে কাড়িয়া লইবে ; আর আমি কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া তাহা দেখিব ? না, এ দেহে এক-বিন্দু তুর্কী রক্ত থাকিতে তাহা হইবে না। সেলিম ত ছার,—সমগ্র পৃথিবী বাদী হইলেও প্রিয়তমা মেহেরের প্রতি কেহ অসম্মান বা অশিষ্টাচার করিতে পারিবে না।”

এই সময় অতুল্যসুন্দরী মেহেরন্নেসা আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। জ্যোৎস্নার পার্শ্বে যেন বিদ্যুৎ আসিয়া মিলিত হইল। মেহেরকে দেখিয়া সের আপন মনে বলিলেন,

“আ মরি মরি ! কি বিচিত্র উপকরণে বিধাতা এ কনক-প্রতিমা গঠিত করিয়াছেন ! এই প্রতিমা সেলিম-দস্যু আমার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে ? না, আমি বাঁচিয়া থাকিতে পাপিষ্ঠের সে পাপ-বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হইবে না !”

মেহের,—আদর্শসুন্দরী মেহেরু ত থাকিতে স্বামীর হাত ধরিয়া কহিলেন, "কি পূণ বা।" প্রাণেশ্বর? আপনমনে কাহাকে কি বলিছে বুঝি-সেরের চমক ভাঙ্গিল। আদরে সহধর্ম্মিণী অধর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি, দরিদ্রের ভাগ্যে কোন অমূল্য রত্ন লাভ হইলে লোকের বড় ঈর্ষা হয়।"

মেহের হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বেশ ত, তাতে রত্নেরই গৌরব বাড়ে, আর দরিদ্রেরও প্রতিপত্তি হয়।"

"কিন্তু এই গৌরব ও প্রতিপত্তিই,—অনেক সময় কাল হইয়া থাকে।"

"তাই বলিয়া কি কেহ রত্ন পথে ফেলিয়া দিয়া, লোষ্ট্র কুড়াইয়া গৃহে আনে?"

"না।—যে, রত্নের প্রকৃত আদর বুঝে, সে প্রাণ দিয়াও সে রত্ন রক্ষা করে।"

"তবে আর কি,—দরিদ্র হইলেও সে রত্নাধি-পতি!"

"তাই বলিতেছি, রত্নাধিপতি বলিয়াই লোকে হিংসা করে।"

স্পর্শ করিয়া ফিরা যাদের স্বভাব-ধর্ম্ম, তারা শুধু ধর্ম্মপত্নী ;— লোষ্ট্রেও হিংসা করে।—ভাবে, যদি সে ধর্ম্মাষ্ট্রও কালে তাদের চেয়ে মূল্যবান্ হয়।"

"সে কথা ঠিক। তবে হিংসার দংশনটা কিছু জ্বালাময়। সকলে সে জ্বালা সহিতে পারে না।"

"যারা দুর্ব্বল, অপোক্ত,—সবে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, তাদেরই জ্বালাটা কিছু অধিক বোধ হয়। কিন্তু ভাল খেলুড়ে যে, সে এই হিংসা-সাপটা নিয়ে খেলাতে বড় ভালবাসে।"

"কিন্তু সাপটা যদি আসল জাত-সাপ হয়?"

"জাত-সাপও শিক্ষাগুণে বশ মানে। তবে সে রকম খেলুড়ের সংখ্যা খুব কম। কাজেই জাত-সাপকে বাগে পাইলেই, তার বিষ-দাঁতটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।"

"আমিও তাই ভাবিতেছি।"

স্নেহের ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,

"কিন্তু এ ত গেল রূপক কাহিনী, আসল কথাটা কি বল দেখি?—তুমি কার কি পূর্ণ হইবে না, বলিতেছিলে?"

"বলিতেছিলাম, আমি জীবিত থাকিতে সেলিম-সাপ তোমায় দংশিতে পারিবে না।"

বুদ্ধিমতী মেহের ইঙ্গিতেই সকল কথা বুঝিলেন। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তা তুমি সে সাপটাকে রাখিতে ইচ্ছা হয় রাখ, মারিতে ইচ্ছা হয় মার ; আমি কিন্তু সে সাপটা পাইলে পুষি ;—এক একবার খেলাইয়াও লই।"

সের ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "সে কি ?"

মেহের স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "ভয় নাই ; পোষা-কুকুর মনিবকে কামড়ায় না। তেমনি মনে কর, পোষা সাপ লইয়া যদি আমি খেলি, ত আমার খেলাইয়াই সুখ ;—সাপ আমায় কিছু করিতে পারিবে না। বরং সাপের জোরে, সময়-শিরে আর দশটা কাজ পাব।"

"কাজ নাই সে কাজে।—সাপ পোষা কি সাপ নিয়ে খেলা—আমি ভাল বুঝি না। সাপ—সাপ ; সাপ কখন পোষ মানে না ;—বাগে পেলেই সে ছোব্‌লায়।"

"সে কথা ঠিক বটে। তবে আমার কিছু কড়া জান্। শুনিয়াছ ত, সেই নির্জ্জন মরু-প্রান্তরে,

আমার পরিত্যক্ত দশায়, সাপ আমার মাথায় ফণা ধ'রে ছিল!—তবুও আমায় দংশন করে নাই।"

"তার ফলে তোমার রাজেন্দ্রাণী হইবার কথা; কিন্তু আজ তুমি দরিদ্র সের আফগানের ঘরণী।"

"সের আফগান দরিদ্র, কে বলিল?—এই ত তুমি বলিতেছিলে, দরিদ্রের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইয়াছে?"

"প্রিয়তমে, তুমিই আমার সে অমূল্য রত্ন!"

"যদি আমাকে অমূল্য রত্ন বলিয়াই জান, তবে তুমি দরিদ্র কিসে?"

"সেলিমের তুলনায় বটে।"

"সেকি, সেলিম অপেক্ষা তুমি আপনাকে দরিদ্র ভাব? এটি তোমার ভারি ভুল। সেলিম যদি তোমাপেক্ষা ধনী হইবে, তবে তোমার প্রতি তাহার হিংসা হইবে কেন? হিংসা কি কখন নিম্নগামী হয়?—সেলিম বড় দুঃখী জানিও। অদৃষ্ট বড় মন্দ না হইলে মানুষ হিংসা করে না।"

"সে কথা সত্য। কিন্তু তা বলিয়া ত আমি হিংস্রক সর্পকে প্রশ্রয় দিতে পারি না?"

"সাপের মাথায়ও মণি থাকে।"

এবার সের একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "তবে কি মণির লোভে তুমি সাপ পুষিতে চাও?"

"না, নিশ্চয়ই না,—কখনই না।"

তেজ-অভিমান-গর্ব্বমিশ্রিত স্বরে,—ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া, চক্ষুর দৃষ্টি স্থির করিয়া, সেই অপরূপ রূপদীপ্তিময়ী মেহেরলূনেসা বলিলেন,

"না, নিশ্চয়ই না,—কখনই না। প্রাণেশ্বর, তেমন নীচরক্তে আমার জন্ম হয় নাই। মণির লোভে আমি সাপ পুষিতে চাই নাই। সাপ কি বাঘ—এমনই কোন ভীষণ হিংস্রক জন্তুকে বশীভূত করিতে না পারিলে, কি নর-জন্ম আর কি নারী জন্ম,—আমি তেমন গৌরবময় বোধ করি না। যতই হোক, সেলিম রাজপুত্র; দুর্ম্মতিবশে যদিই তিনি আমার বা তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি ক্ষমার পাত্র। ঈশ্বরের শপথ,—আমি তাঁহাকে ভালবাসিয়া একথা বলিতেছি না,—দয়াবশেই ইহা বলিতেছি। দয়া এক, ভালবাসা আর। আশা করি, এরূপ বলিলাম বলিয়া, আমার চিত্তের প্রতি তুমি সন্দিহান্ হইবে না।"

সের আফগান যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। তিনি মুক্ত অন্তরে প্রণয়িনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মেহেরের সেই উদ্দীপ্ত রূপ-শ্রীর সহিত এই তেজস্বিতা, তাঁহার চক্ষে বড় সুন্দর বোধ হইল। তিনি,—অভিমানিনী মেহেরের করপদ্ম দু'টি স্নেহভরে ধারণ করিয়া কহিলেন,

"প্রিয়তমে, কথাটা যে তুমি এত গুরুভাবে গ্রহণ করিবে, ইহা আমি ভাবি নাই। আমি বলিতেছিলাম কি, যুবরাজ সেলিমের নিকট হইতে আমাদিগকে দূরে থাকিতে হইবে। কারণ তিনি আমার প্রতি অতিমাত্র বক্র। সে বক্রতা এত যে, আমার জীবনের প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য আছে। কেবল সম্রাটের ভয়ে প্রকাশ্যে তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। হায়, আমি জানিতাম না যে, তিনি অন্তরের অন্তরে তোমার প্রণয়প্রার্থী, এবং আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী! এখন তাঁহার কার্য্যকলাপ ও ব্যবহার দেখিয়া ইহা বুঝিতেছি। বুঝিতেছি, আমাকে অচিরাৎ রাজধানী ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ এরূপ চক্রান্তের মধ্যে থাকিয়া দুরূহ রাজকার্য্য পরিচালন করা সুকঠিন।"

"সে কথা শতবার শ্রেয়ঃ। আমি চিরদিন তোমার ইচ্ছার অনুগামিনী।"

কথাটা হইতেছে এই যে, সের আফগানের সহিত মেহেরন্নেসার পরিণয় হইবার পর, সেলিমের হৃদয় ঘোর ঈর্ষায় পূর্ণ হইল। সেলিম বিবিধ মতে সের আফগানের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তবে পিতার ভয়ে প্রকাশ্যভাবে তিনি কিছু করিতে পারিলেন না;—নীচমনা কয়েকজন উজির ও ওমরাহকে হস্তগত করিয়া, তিনি গোপনে নানাবিধ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে সের বড়ই বিরক্ত ও উত্যক্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই স্থানান্তর গমনের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

সংসারে যে বড়, তার শত্রু অনেক। সের আফগান বড়, সুতরাং সের আফগানের শত্রু অনেক। রাজদ্বারে সম্মান, সম্রাটের বিশেষ শ্রদ্ধা, আপামর সাধারণের ভালবাসা, সর্ব্বত্র যশঃ ও খ্যাতি,—সের আফগানের এবংবিধ অপার্থিব সম্পদে,—রাজধানীর প্রায় যাবতীয় উজীর-ওমরাহ মনে মনে তাঁহার শত্রু ছিলেন। তার উপর, সেই

সের সকলের ঈপ্সিত ধন—অতুল্য ললনা-রত্ন লাভ করিল,—এমন কি স্বয়ং বাদসাহ উদ্‌যোগী হইয়া তাহার সহায়তা করিলেন,—সমপদস্থ ব্যক্তির এতটা সৌভাগ্য কি সহ্য হয়? পূর্ব্ব হইতেই এই সকল নীচমনা রাজকর্ম্মচারী সেরের সম্মান-মর্য্যাদার হিংসা করিত; এখন যুবরাজ সেলিম তাহাদের অগ্রণী হওয়ায়, তাহাদের সেই হিংসা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ ঘটিল। তাহারা বিধিমতে সের আফগানকে সম্রাটের বিরাগভাজন [illegible] ইল। রাজকীয় সকল কার্য্যেই [illegible] রিতে চেষ্টা পা [illegible] [illegible] টি অন্বেষণ করিতে সের আফগানের ভ্রম-ত্রু [illegible] লাগিল; এবং সর্ব্বসময়েই না [illegible] রূপ অছিলা ও কথার খুঁটীনাটী ধরিয়া এবং [illegible] নানা [illegible] বিষয়ের বাদ-প্রতিবাদ করিয়া সেরের গৌরব হানি ও মর্য্যাদা হ্রাসের চেষ্টায় নিরত রহিল। সের নীরব-প্রার্থনায় সম্রাটের নিকট আপন অবস্থা জানাইলেন। সম্রাট মনে মনে সকল বুঝি [illegible] লেন; কিন্তু বুঝিয়াও সহসা কিছু করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহাকে ত সকলকে লইয়া রাজ্যপাট চালাইতে হইবে? এমত অবস্থায়, সের

আফগান স্থানান্তরে থাকিয়া রাজকার্য্য করেন,—সম্রাটেরও এইরূপ ইচ্ছা হইল।

এই সময় বাঙ্গলার বর্দ্ধমান বিভাগে এক-জন রাজ-প্রতিনিধি নিয়োগের আবশ্যক হইল। আকবর বিবেচনা করিলেন, "সের আফগান সর্ব্বাংশে এই পদের যোগ্য। এই অবসরে সেরকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া বর্দ্ধমান প্রেরণ করি;—আমার দুই দিক্‌ই রক্ষা হইবে।"

সম্রাটের ইচ্ছামতই কার্য্য হইল। সেরও পরমাহ্লাদে, বিশিষ্ট গৌরবের সহিত এই পদ গ্রহণ করিয়া, সস্ত্রীক বর্দ্ধমান রহনা হইলেন। নীচ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া,—ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বিষ-বায়ু হইতে দূরে থাকিয়া,—তিনি উদার ও উন্নত প্রণালীতে রাজ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এবং আপন অতুল্য গুণগ্রামে অতি অল্পকাল মধ্যেই বাঙ্গলার সর্ব্বত্র সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেন। সেলিম ও তাঁহার কুচক্রীগণের কু-অভিসন্ধি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া, সের আফগান কিছুদিন খুব শান্তি-সুখে কাল কাটাইলেন। রূপবতী ও গুণবতী মনোমোহিনী যুবতী ভার্য্যাকে লইয়া,—সর্ব্বপ্রকারে সফল-কাম হইয়া,—মনুষ্যজন্মের সকল সুখ ভোগ করিয়া,—কিছুকাল তিনি নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিলেন। এই বর্দ্ধমানে তাঁহার একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। সন্তান-বাৎসল্য-সুখেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন না।

কিন্তু হায়, নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ নরভাগ্যে নাই। সের আফগানের সুখের নির্দ্দিষ্টকাল অবসানের সঙ্গে সঙ্গে,—ভারত-সম্রাট আকবর ইহলোক ত্যাগ করিলেন; অথবা আকবরের

অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে,সের আফগানের সৌভাগ্য-সূর্য্যও চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল।

আকবরের অবসানের পর যুবরাজ সেলিম,—জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া ভারত-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এবং তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, সের আফগানের সুখ-শশী চির-অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

সের আফগান ভাবিয়াছিলেন,—সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে,—বিশ্ব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব-প্রকৃতিরও কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—এমত অবস্থায় সেলিমের আর তাঁহার উপর কোনরূপ রাগ-দ্বেষ নাই,—তাঁহার রূপসী ভার্য্যা মেহেরল্নেসার রূপ-তৃষায়ও সেলিম প্রপীড়িত নন,—সে নিরাশপ্রণয়ের তীব্র যন্ত্রণানুভবও সেলিম এখন করেন না।—বিশেষ সেলিম এখন রাজ-রাজেশ্বর,—ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ;—এত বড় একটা পদ-গৌরব ও আত্মমর্য্যাদা স্মরণ করিয়াও অন্ততঃ তিনি এখন একজন অমাত্যের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিবেন না এবং সেই অমাত্য-পত্নীর রূপ-মোহেও অভিভূত হইবেন

না। সের আফগান নিজে সরল ও সাধুচিত্ত; তাই সরল ও সাধুভাবে বিষয়টাকে মনে মনে এইরূপ মীমাংসা করিলেন। ভাবিলেন। "না, অযথা কাহাকে অবিশ্বাস করিতে নাই। যে অন্যের প্রতি বিশ্বাস হারাইল, সে নিজের কাছেও অবিশ্বাসী হইল। যে অবিশ্বাসী, তার বাড়া দুর্ভাগ্য আর নাই।"

এদিকে সেলিম, ভারত-সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, সর্ব্বশক্তির অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু ভারতেশ্বর হউন আর দুনিয়ার মালিক হউন,—হিংসা-রাক্ষসীর হাত হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন না। তাঁহার হৃদয়-কন্দরে বহুদিন হইতে সেই যে ঈর্ষার আগুন ধিকি ধিকি প্রধূমিত হইতেছিল,—এক্ষণে সময়গুণে বাতাস পাইয়া তাহা দপ্ দপ্ জ্বলিয়া উঠিল। সেলিমের মনে প্রতিহিংসা জাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,

"এইবার সের আফগানের দর্প চূর্ণ করিব। তাহার সকল সুখ, সকল সৌভাগ্য,—তাহার মনুষ্য-জন্মের সফল স্বপ্ন,—এইবার আমি ঘুচাইব। এতদিন কালের মুখ চাহিয়া, একমাত্র সহিষ্ণুতাকে

সম্বল করিয়া নীরব ছিলাম,—কাল পূর্ণ হইয়াছে, এইবার হতভাগ্যের অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে।—তাহার অসম সাহসের বিষম প্রতিফল এইবার আমি তাহাকে দিব।—তাহার বড় সাধের রূপসী তরুণীভার্য্যা,—আমার হৃদয়-উদ্যানের প্রেম-পারিজাত,—সেই মানস-প্রতিমা মেহেরেল্-নেসাকে,—এইবার আমি নিষ্কণ্টকে লাভ করিব। —আমার প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ?"

হায়, রমণী রূপ-লাবণ্য !

বস্তুতঃ সেই অপরূপ রূপ-প্রতিমা মেহেরেল্-নেসাকে সেলিম একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার অন্তরের অন্তরে মেহের-প্রতিমা নিশিদিন বিরাজ করিত। সে রূপ-রশ্মিতে তিনি প্রতিনিয়ত নীরবে পুড়িতেন। পিতার ভয়ে তখন কোনরূপ অবৈধ প্রতিকারের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। বিশেষ দূরদর্শী সম্রাট কৌশলক্রমে, সের আফগানকে সস্ত্রীক রাজধানী হইতে বহু দূরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! দূরত্বে কি প্রেমের পরিমাণ ? দূরত্ব চর্ম্মচক্ষুর অন্তরাল করে বটে ; কিন্তু তাহার ফলে কল্পনার চক্ষু বুঝি অধিকতর

"তবে এখন কি কর্ত্তব্য ?"

"তোমার দিল্লীতে যাওয়াই কর্ত্তব্য,—প্রভুর আদেশ।"

"আর তুমি ?"

"আমি এখানেই থাকিব।"

"এই বর্দ্ধমানে,—একাকী ?"

"কি করিব,—আমি যাইলে তোমার অধিক বিপদের সম্ভাবনা।"

"আমার বিপদকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করি।—সের আফগানের বিরুদ্ধে মানুষ তৃণমাত্র। তবে তোমার জন্য চিন্তা।"

"সেই জন্যই বলিতেছি, আমাকে সঙ্গে লইও না,—তুমি একাকীই যাও।"

সের বুঝিলেন, কথাটা যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে ইহাও ভাবিলেন, "এত দিন না দেখিয়া সেলিম হয়ত মেহেরকে ভুলিয়া গিয়াছে,—পুনর্দর্শনে সেই লুপ্তানুরাগ পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে।—অতএব আমার একাই দিল্লী যাওয়া বিধেয়। ভয় কি, আমার সুনাম ও প্রতিষ্ঠা আমায় রক্ষা করিবে।"

মেহেরল্লিসা মনে মনে বলিলেন, "বিজ্ঞ সম্রাট পরলোকগত ; রূপোন্মত্ত নব্যযুবক ভারত-সিংহাসনে উপবিষ্ট ;—আজিও আমার জন্য তাঁহার মন চঞ্চল ;—জানি না, অদৃষ্টে কি আছে।"

পত্নীকে বর্দ্ধমান রাখিয়া যাইবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া, সের যথাদিনে দিল্লী যাত্রা করিলেন। এবং যথাদিনে দিল্লী পঁহুছিয়া, সম্রাট সকাশে উপনীত হইয়া, বিশিষ্ট সম্মান ও সংবর্দ্ধনার সহিত রাজসভায় স্থান পাইলেন। তখন সের আফগানের মনে হইল,

"আমি মিথ্যা সন্দেহে মনে মনে প্রভুদ্রোহী হইয়াছি। না, অবিশ্বাস-প্রেতকে আর কিছুতেই হৃদয়ে স্থান দিব না। মেহেরের অনুমান ভুল। বিধাতা যাহাকে ভারত সিংহাসনে বসাইলেন, তাহার মন অত নীচ হইতে পারে না।—সঙ্গ-দোষে কিছুদিনের জন্য সেলিমের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল মাত্র।—এখন আবার রাজাসনে উপবেশনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও উন্নতি হইয়াছে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজ্য-সংক্রান্ত দুই চারি কথা আলোচনা করিয়া, দুই চারিদিন সের আফগানকে এটা সেটা কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া, সেলিম এক দিন প্রস্তাব করিলেন, "বহুদিন শিকার করা হয় নাই,—শিকারে বড় আমোদ জন্মে,—চল, সকলে মিলিয়া এক দিন শিকার-যাত্রা করি।"

উজীর-ওমারহগণের দুই একজন পূর্ব্বশিক্ষামত বাদসাহের প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলেন। অমনি আর সকলেও তৎক্ষণাৎ একমত হইল। প্রভুর ইচ্ছার পোষকতায় ভৃত্যের লাভ আছে কি ? তাই অমনি প্রস্তাবমাত্রেই সম্মতি প্রকাশ ;—সকলেই বিশেষ উৎসাহের সহিত, সেলিমের সমভিব্যাহারী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সের আফগানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য

করিয়া সেলিম বলিলেন, "এখন, তোমার অভি-প্রায় কি? শিকার-ক্রীড়ার পর তুমি বর্দ্ধমান রহনা হইবে, না ইতিমধ্যে তথায় যাইতে চাও?"

"জাঁহাপনার যেরূপ অভিপ্রায়।—তবে যখন সকলেই ক্রীড়া-সুখ সম্ভোগ করিবেন, তখন এ নফরই বা কেন বঞ্চিত থাকে?"

সেলিম। অতি উত্তম।—দেখ সের, তোমার উপর আমি বড়ই সন্তুষ্ট। তোমার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া স্বর্গীয় সম্রাট যেমন তুষ্ট ছিলেন, আমিও সেইরূপ তুষ্ট জানিও। তোমার বিচক্ষণতায় বাঙ্গলা মুলুক বেশ সুশৃঙ্খলায় শাসিত হইতেছে। তোমার পরামর্শগ্রহণে কার্য্য করা আমার শ্রেয়ঃ। সেই জন্যই তোমাকে রাজধানীতে আনাইয়াছি।

মনে মনে বলিলেন,"এই আপাতমধুর বাক্যে, কৌশল করিয়া তোমার প্রাণবধ করিব;—তবে আমার হৃদয়-জ্বালা জুড়াইবে! ওঃ! এই ঘৃণিত মুখ,—সেই লোকললামভূতা রূপসীর মুখ-পদ্ম স্পর্শ করিতেছে! আমার বাঞ্ছিত ভোগ্য,—এই পাপিষ্ঠ কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইয়াছে।—দুষ্মনকে ভীষণ ব্যাঘ্র-মুখে নিধন না করিলে আমার আর স্বস্তি নাই।"

সের পরম পুলকিত চিত্তে উত্তর করিলেন, "অধীনের প্রতি জাঁহাপনার এ অনুগ্রহ,—জাঁহাপনার মহত্ত্বেরই পরিচয় ;—অধীন আপন কর্ত্তব্য করে মাত্র।"

মনে মনে কহিলেন, "এই মহামনা সম্রাটকে মনে মনে অবিশ্বাস করিয়া, সত্য সত্যই আমি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছি।"

পরস্পরের এইরূপ শিষ্টাচার ও আলাপ-আপ্যায়িতের পর সেলিম সমাগত উজীর ওমরাহগণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ভালই হইল,—শিকারটা খুব জাঁকালো রকমের হইবে দেখিতেছি। যখন বীরাগ্রগণ্য সের আফগান্ স্ব-ইচ্ছায় শিকারে প্রবৃত্ত হইবেন বলিলেন, তখন আশা করা যায়, বহুকালের পর এবারের শিকার-ক্রীড়ায় যথেষ্ট আনন্দ হইবে।—সেরের সে অদ্ভুত সিংহ-শিকারের কথা সকলের স্মরণ আছে ত?"

ইতিপূর্ব্বে সের আফগান অসাধারণ বলবিক্রমে ও অসমসাহসে এক সিংহের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য দেশ বিদেশে তাঁহার বীরত্বের কথা প্রচারিত হয়। সমাগত সভ্যমণ্ডলী, শতমুখে

সম্রাটবাক্যের পোষকতা করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেরের উৎসাহ ও সাহস দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিকার-যাত্রার দিন স্থির করিলেন।

সেলিমের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। মহা-সমারোহে শিকার-যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল।

স্বয়ং ভারত-সম্রাট শিকারে যাইবেন,—রাজধানীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শিকারোপযোগী বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইল। শত শত সুশিক্ষিত হস্তী ও অশ্ব সুসজ্জিত হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্টদিনে শত শত অশ্বারোহী ও গজারোহী সৈন্য,—সেই সব হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, উন্মুক্ত অসি হস্তে বিজয়-পতাকা উড়াইয়া, রাজপথে বহির্গত হইল। সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়ায় সেই সব শাণিত কৃপাণ ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত উজীর ও ওমরাহগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া,—কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গীর,—ঐরাবত তুল্য এক মহাকায় গজপৃষ্ঠে

মুহূর্ত্তমধ্যে শত শত লোক নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ, যন্ত্র-পুত্তলিবৎ হইয়া গেল ;—কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তাঁহার কথার উত্তর দেয়। তিনি মনে মনে কিছু বিরক্ত হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী তিনজন বিশিষ্ট ওমরাহের প্রতি একবার তীব্রকটাক্ষে চাহিলেন।—যেন কি ইঙ্গিত করিলেন। সেই বিষম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় তিনি গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "তবে কি বিশাল মোগলরাজ্য বীরশূন্য হইয়াছে যে, সাহস করিয়া কেহ একাকী একটা ব্যাঘ্র বধ করিতে পারে না ?"

এইবার সেই আমীরত্রয়, কি ভাবিয়া সুস-জ্জিত গজপৃষ্ঠ হইতে ভূমে অবতীর্ণ হইলেন। এবং তীর, অসি, বল্লম, বর্ষা প্রভৃতি যাবতীয় অস্ত্রে-শস্ত্রে রীতিমত সজ্জিত হইয়া, সম্রাটকে এক একটা লম্বা সেলাম করিলেন। যেন তাঁহারা তিনজনেই সম্রাটের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত, —এই ভাব জানাইলেন। সম্রাটও যেন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের একজনকেই ব্যাঘ্রবধে অনুমতি দিবেন,—আকার-ইঙ্গিতে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন।

অদূরে আপন অশ্বোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া, বীরাগ্রগণ্য সের আফগান গম্ভীরভাবে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। সহসা কি ভাবিয়া তিনি ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। ধীরে ধীরে কোষমধ্যস্থ-তরবারি খানি অশ্বপৃষ্ঠে রজ্জুসংলগ্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। তার পর ধীরে ধীরে সম্রাটের সম্মুখীন হইয়া, সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া, জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন,

"জাঁহাপনা, যদি অনুমতি হয়, ত এ অধীন নিরস্ত্র হইয়া একাকী ঐ ব্যাঘ্র বধ করে।"

সকলে নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ, ঈষৎ ভয়-চকিত। সেই শিকারোদ্যত আমীরত্রয়ও মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেরের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সের আফগান মনে মনে বলিলেন, "কি, আমি বিদ্যমানে প্রতিদ্বন্দ্বী জয়যুক্ত হইবে?—এতক্ষণ দেখিতেছিলাম, কে কতদূর শক্তি ও সাহস ধরে?"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "জাঁহাপনা, সশস্ত্র হইয়া একটা ব্যাঘ্রবধে পৌরুষ কি? ঈশ্বর যাহাকে

নিরলম্বনে বনের পশু করিয়া বনে রাখিয়াছেন, তাহার সহিত যুঝিতে হইলে, নিরলম্বনে যুঝাই বীরত্ব। এই দেখুন, আমি নিরস্ত্র হইয়া আসিয়াছি;—এই বাহুই আমার একমাত্র সম্বল। মাননীয় ওমরাহগণকে জিজ্ঞাসা করুন,—আমার এই কার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে উহাঁরা কেহ অভিলাষী কিনা?"

সম্রাট ইঙ্গিতে সমবেত সহচরগণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা সকলেই অধোবদনে অসম্মতি জানাইলেন। এই অসম্মতি প্রকাশের সময়ও তাঁহাদের মুখে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইল;—যেহেতু তাঁহাদেরই একজন, দলস্থ সকলের অক্ষমতা প্রতিপন্ন করিয়া আপন বীরত্ব-প্রকাশে উদ্‌যোগী হইতেছে।—হায় হিংসা! বধ্যভূমে হীন কৌশলে একজনকে প্রাণে বধ করিতে আনিয়াও, তুমি আপন স্বভাবধর্ম্ম ভুলিতে পারিতেছ না!

সেলিম অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া সের আফগানকে ধন্যবাদ করিয়া কহিলেন, "বীর, যাহার কার্য্য, তাহারই সম্ভবে। বুঝিলাম, বিধাতা

তোমাকে অসীম সাহস ও অসাধারণ মনোবল দিয়াছেন। এখন তুমি তোমার অতুল্য বীরত্বে সকলকে চমৎকৃত কর। কিন্তু মনে রাখিও, ঐ ভীষণ জন্তুর সহিত শেষপর্য্যন্ত তোমায় একাকীই যুঝিতে হইবে,—কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য তুমি পাইবে না।"

"জাঁহাপনা, নফরের গোস্তাকী মাপ করিবেন,—আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বেই এইরূপ অভিমতি প্রকাশ করিয়াছি।"

সেলিম যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন,—"হাঁ, হাঁ, প্রকৃত বীরকে কোনরূপ আশঙ্কায় বিচলিত করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। তবে কথাটা হইতেছে নাকি, এটা একটা বিশুদ্ধ শিকার-ক্রীড়া,—তাই শিকারের পদ্ধতিটা তোমায় স্মরণ করিয়া দিতেছি মাত্র।—নহিলে সকলে মিলিয়া বাঘটাকে ত এক লহমার মধ্যেই মারিয়া ফেলা যায়;—তাহাতে আর পৌরুষই বা কি, আর আমোদই বা কি?"

মনে মনে বলিলেন, "রও, বদবখৎ! আর মুহূর্ত্ত পরেই তোমার সকল দম্ভ দূর করিতেছি!

নিরস্ত্র হইয়া ঐ ভীষণ জন্তুর গ্রাস হইতে তুমি আপনাকে রক্ষা করিবে? যাও মূঢ়,—যাও ;— আমার ঈপ্সিত পথের কণ্টক দূর হও!—রাজবুদ্ধি তুমি ভেদ করিবে? হতভাগ্য, ভারতের রাজাধিরাজের সহিত প্রতিযোগীতা? আমার বাঞ্ছিত বস্তু উপভোগ?”

সের আর কালব্যজ না করিয়া, একাকী মল্লবেশে সেই ভীষণ ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইলেন। ব্যাঘ্র চারিদিকে অত লোক-সমাগম দেখিয়া, লম্ফ প্রদানে পলায়নেরও পথ না পাইয়া, নতমুখে, গুটিসুটী মারিয়া পড়িয়াছিল; এবং এক একবার মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়াও দেখিতেছিল। মহাবল সের অসম সাহসে তাহার সম্মুখে আসিলেন, সে যেন দেখিয়াও দেখিল না। সের তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া টানিলেন। এইবার স্বাভাবিক হিংসাবশে মুখ বিকৃত করিয়া ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তখনই আবার কি ভাবিয়া, দুই হাত অন্তরে গিয়া, মরার মত হইয়া শুইয়া পড়িল। বাঘ ত বুঝে নাই, মাত্র এই লোকটাই তাহার গ্রাসে পড়িয়া প্রাণ দিতে আসিয়াছে, আর

শত শত লোক কৌতুক দেখিবার জন্য কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া থাকিবে !

বাঘটা যেমন দুই হাত অন্তরে গিয়া মরার মত শুইয়া পড়িল, সের আফগানও অমনি ভীমপদে উপর্য্যুপরি তাহাকে দুই তিনবার আঘাত করিলেন। এইবার বাঘ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। মরণ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তবে মরণের অগ্রে এই প্রথম আক্রমণকারীর প্রাণবধ করিবে, ইহা সুনিশ্চিত বুঝিল।—সহসা তাহার সর্ব্বশরীর স্ফীত হইয়া উঠিল; গাত্র-লোম কণ্টকিত হইল; উজ্জ্বল চক্ষু-তারা ঘুরিতে লাগিল; বিকট মুখ-বিবরে লোল জিহ্বা লক্ লক্ করিল;—সমবেত দর্শকমণ্ডলী নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। দেখিতে লাগিল, ব্যাঘ্রও যেমন সতেজে দাঁড়াইয়া, পশ্চাতের পদদ্বয়ে বিশেষ ভর দিয়া, স্ফীত লাঙ্গুল ভূমে আঘাত করিতেছে, এবং অস্ফুট ভীষণ শব্দের সহিত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে,—অসীম সাহসী সের আফগান্ও অমনি সেই ভীষণ জন্তুর ভীষণ চক্ষুর প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, বিশেষ সতর্কতার সহিত

পশ্চাতে এক এক পদ হটিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সের একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন,—সেই স্থানে একটি সুদৃঢ় প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল;—সেই বৃক্ষের মূলদেশে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত, ব্যাঘ্রের চক্ষুর দৃষ্টির সহিত আপন চক্ষুর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সের অতি সাবধানে ঐরূপ এক এক পা হটিতে লাগিলেন। সমগ্র দর্শকমণ্ডলী,—এমন কি স্বয়ং বাদসাহও,—মুহূর্ত্তের জন্য রোষ-হিংসাদি বিস্মৃত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন,—যেমন সেই ভীষণ ব্যাঘ্র ভীষণ থাবা তুলিয়া ভীষণ সংহারমূর্ত্তিতে লম্ফ দিয়া আততায়ীকে ধরিবার উপক্রম করিতেছে, সের আফগানও অমনি পলকহীন নেত্রে অতি সন্তর্পণে পশ্চাতে হটিতে হটিতে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য-স্থানে আসিতেছেন। যথাস্থানে আসিয়া সের স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।—সেই সুদৃঢ় বৃক্ষের মূলদেশে দক্ষিণ পদে সম্পূর্ণ ভর রাখিয়া, বাম-পদটি অগ্রসর করিয়া দিলেন।—তিনিও যেন সম্মুখে লম্ফ প্রদান করিবেন, এইভাবে অটল হইয়া দাঁড়াইলেন। এবং সমস্ত প্রস্তুত বুঝিয়া

বহুক্ষণ পরে চক্ষের পলক ফেলিলেন।—তাঁহারও চক্ষের পলক পড়িল, আর অমনি দিক্‌দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত করিয়া,—দর্শকগণের বুক কম্পিত এবং কর্ণ বধির করিয়া, সেই ভীষণ জন্তু এক ভীষণ গর্জ্জন করিল।—সেই গর্জ্জনের সহিত তাহার গাত্রগন্ধের তীব্রতা বুঝি আরও অধিক অনুমিত হইল;—দর্শকগণ নাসিকা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া উৎসুক চিত্তে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন,—সেই বিকট গর্জ্জনের সহিত ব্যাঘ্র ভীমবেগে লম্ফ প্রদান করিল,—এবং আশ্চর্য্য,—ঠিক সেই লম্ফের সঙ্গে সঙ্গে, সেই অদ্ভুত কৌশলী সুশিক্ষিত শিকারী সের আফগানও সম্মুখে—শূন্যে লম্ফ প্রদান করিলেন, এবং চক্ষের নিমেষে, ঝটিতি ধাঁ করিয়া ঘুরিয়া আসিয়া ব্যাঘ্রের লাঙ্গূল ধরিয়া, ভীমবলে, অতি প্রচণ্ডবেগে, চক্রাকারে শূন্যে ঘুরাইতে লাগিলেন। অবিশ্রান্ত দুই তিন মুহূর্ত্ত-কাল এই বিষম ঘূর্ণনে, ব্যাঘ্রের মুখ দিয়া রক্ত মোক্ষণ হইতে লাগিল। সের আফগান সেই অবসরে, সেই ভীষণ জন্তুর মস্তক,—অতি দৃঢ়-রূপে পূর্ণবেগে, পূর্ব্বোল্লিখিত সেই বৃক্ষ-কাণ্ডে

আঘাত করিতে লাগিলেন। উপর্য্যুপরি গুরুতর আঘাতে ও অবিশ্রান্ত রক্তমোক্ষণে, ব্যাঘ্র মৃতবৎ নিজ্জীব হইয়া পড়িল। সের আফগান তখন তাহাকে ভূমে রাখিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য বিশ্রাম করিলেন। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব ও জয় জয় ধ্বনি পড়িয়া গেল। সকলে চমৎকৃত, বিস্মিত ও মোহিত হইল।

পরিশ্রান্ত সের দর্শকগণকে উদ্দেশ করিয়া সংক্ষেপে জানাইলেন, "এখনও শিকার সম্পূর্ণ হয় নাই ;—ব্যাঘ্র এখনও জীবিত আছে।"

এই বলিয়া তিনি সেই আহত ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে সবলে পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই ভীষণ জন্তু ক্রোধান্বিত না হইয়া, যেন দীনতাই প্রকাশ করিতে লাগিল। যেন পোষ্য কুক্কুর প্রভুকে দেখিয়া আব্‌দার করিল :—কখন লেজ্ নাড়িল, কখন জিহ্বা বাহির করিল, কখন বা অস্ফুট মৃদু শব্দ করিল, কখন বা গোঁয়াইল। ফল কথা, সে যেন আর কিছুতেই পুনরাক্রমণে রাজী নয়,—কুকুরের ন্যায় প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে চায়। সের আফগান জানিতেন,—এ অতি ভক্তি

চোরের লক্ষণ ;—এই ভাবে এই দুষ্ট, বলসঞ্চয় করিয়া লইতেছে ;—এখনই তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে। অগত্যা পুনরায় তিনি ভীমবলে সেই প্রকাণ্ড জন্তুর লাঙ্গুল ধরিয়া, পূর্ব্ববৎ চক্রাকারে ঘুরাইতে লাগিলেন এবং সেই বৃক্ষ-কাণ্ডে বারংবার তাহার মস্তক ঠুকিয়া দিলেন। এবারও ব্যাঘ্রের মুখ দিয়া রক্তমোক্ষণ হইল, এবং এবারও সে পূর্ব্বের ন্যায় নির্জ্জীব হইয়া ভূমে পড়িয়া রহিল।

সমাগত দর্শকগণ পুনরায় জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল। কিন্তু সেই জয়-ধ্বনিতে একজন যেন কিছু বিরক্ত হইলেন। তীব্রকটাক্ষে একবার সকলের মুখপানে চাহিলেন ;—তাহাতেই যেন সকলের চমক ভাঙ্গিল। সে একজন,—সেই সের আফগানের বধাভিলাষী,—ভারত-সম্রাট সেলিম। সের আফগান এখনও ব্যাঘ্র-গ্রাসে পতিত হইল না,—সেলিম এজন্য মনে মনে বড়ই দুঃখিত !

দর্শকগণ সম্রাটের এই তীব্র কটাক্ষের প্রকৃত কারণ উপলব্ধি না করিয়া মনে মনে ভাবিল, বুঝি এখনও সের আফগানের জীবন নিরাপদ হয়

নাই,—তাই সম্রাট এ আনন্দ-উল্লাস অনুমোদন করিতেছেন না। বলা বাহুল্য, ষড়যন্ত্রকারী আমীরগণ সম্রাটের বিরক্তির কারণ বিধিমতে উপলব্ধি করিল।

সের আফগান পুনর্ব্বার দর্শকগণকে ইঙ্গিতে জানাইলেন,—এখনও ব্যাঘ্র নিধনপ্রাপ্ত হয় নাই।

এইবার সের সেই আহত, শ্রান্ত, ক্লান্ত পশুর গণ্ডস্থলে মুষ্ট্যাঘাত আরম্ভ করিলেন এবং তাহার উদর লক্ষ্য করিয়া ঘন ঘন পদাঘাত করিতে লাগিলেন। সহসা সেই বিষম আঘাতিত ও আহত শার্দ্দূল ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার যেন তাহার শরীরের আয়তন অধিকতর দীর্ঘ হইল। ভীষণ চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত ও বিকট মুখ-ব্যাদন করিয়া, ব্যাঘ্র এবার ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। সে গর্জ্জনে সেই নিস্তব্ধ অরণ্যানী কম্পিত হইল, এবং সেই শত শত লোক চমকিত হইতে লাগিল। এইরূপ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে, সেই কোপ-প্রজ্বলিত ব্যাঘ্র আততায়ীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী এইবার মনে মনে প্রমাদ

গণিল। কিন্তু সেলিমের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না।—তাঁহার চক্ষু হর্ষোৎফুল্ল হইল; অধরোষ্ঠে ঈষৎ হাস্য-রেখা দেখা দিল; বক্ষ আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিলেন, "আঃ! এতক্ষণে আমার মনস্কাম পূর্ণ হইল! এইবার ঐ দুষ্‌মন্‌ নিশ্চয়ই জাহান্নমে যাইবে!—ঐ যে ব্যাঘ্র পাপিষ্ঠের উরুদেশ দংশন করিয়াছে!—দেখি, আল্লার মর্জ্জি!"

কিন্তু, আল্লার মর্জ্জি হইল না! ব্যাঘ্র পূর্ণমাত্রায় আক্রমণ করিতে-না-করিতে, সের আফগান অপূর্ব্ব শিক্ষাকৌশলে শূন্যে লম্ফপ্রদান করিলেন, এবং ভূমে পড়িয়াই অসীম সাহসে, অতি ক্ষিপ্রহস্তে সেই মুখব্যাদানযুক্ত ব্যাঘ্রের জিহ্বা পূর্ণবেগে আকর্ষণ করিলেন। ভীষণ গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে, শিকারীকে লইয়া ব্যাঘ্র ঘুরিতে লাগিল। এবং সেই অবসরে সহসা সম্মুখের দুই পায়ের থাবা শিকারীর বক্ষোপরি বসাইয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে উরুদেশ হইতে কিয়দংশ মাংস তুলিয়া লওয়ায় এবং উপস্থিত বক্ষোপরি থাবা মারায়, সের আফগান রক্তাক্ত-কলেবর হইলেন।

কিন্তু এ সকলে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই ;—তিনি তখন এক মন এক প্রাণ হইয়া, শরীরের সবটা শক্তি নিয়োজিত করিয়া, ব্যাঘ্রের জিহ্বা আকর্ষণ করিতেছেন। সেই বিষম আকর্ষণে ব্যাঘ্রের জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল এবং তাহার মুখ দিয়া অশ্রান্তধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। এইরূপ রক্ত বহির্গত হইতে হইতে বাঘ পঞ্চত্ব পাইল।

এতক্ষণে সের আফগান সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠোপরি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আপনার সেই রক্তাক্ত বক্ষঃ স্ফীত করিয়া, সাহ্লাদে, সসম্ভ্রমে সম্রাটকে একটি দীর্ঘ সেলাম করিলেন।

চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। চক্ষুর্লজ্জার খাতিরে এবার সেলিমও সেই জয়ধ্বনিতে যোগ দিয়া, সের আফগানকে প্রতি-অভিবাদন করিলেন।

তখন রাজকীয় সৈন্যসামন্তগণ উৎসুকচিত্তে আনন্দভরে সের আফগানের সম্মুখীন হইল, এবং সময়োচিত শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে অগণিত ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

সম্রাটের আদেশে তৎক্ষণাৎ শিবিকা প্রস্তুত

হইল। আহত সের সেই শিবিকায় আরোহণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

সম্রাট, সের আফগানকে মৌখিক যথেষ্ট আদর-আপ্যায়িত করিলেন ;—এমন কি গুণের পুরস্কার স্বরূপ গলদেশস্থ বহুমূল্য হারও তাঁহাকে উপহার দিলেন ;—যাহাতে সের ঘুণাক্ষরেও তাঁহার দুরভিসন্ধির কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে সেলিম হিংসায় গর্জ্জিতে লাগিলেন ;—

"ওঃ, কি কঠিন জান্! সত্যই সের আফগান এতই বলশালী ?—হা হতভাগ্য! এত বীর্য্যবান্ ও গুণবান্ হইয়া, কেন তুই সম্রাটের অভিলষিত নারী-রত্নের অধিকারী হইয়াছিলি ? অথবা, তোর দোষ কি,—তোর নিষ্ঠুর অদৃষ্টই তোকে আমার কোপানলে ফেলিয়াছে! এ যাত্রায় তুই এই ব্যাঘ্রের মুখে রক্ষা পাইলি বটে ; কিন্তু আজি হউক আর কালি হউক,—আমার বিষম চক্রান্তে তোকে প্রাণ হারাইতেই হইবে! তার পর ?—তার পর সে অনুপমা রূপসী ললনাকে লইয়া আমি অতুল সুখে রাজ্যভোগ করিব।—কি বলিব, বিধাতা আমাকে

সম্রাট করিয়াছেন,—তাই এ সাম্রাজ্যের মুখ চাহিয়া,—তুচ্ছ লোকনিন্দা, যশঃ, মান, ভয়,—এ সকল ভোগ করি! নচেৎ, সাধারণ মানবকুলে জন্ম-গ্রহণ করিলে,—ওঃ! কি বলিব, সে অপরূপ রূপ-প্রতিমায় কি আমি আজিও বঞ্চিত থাকি? জগদীশ্বর! আমায় এ বাদসা-গিরি না দিয়া যদি ফকিরী দিতে?—আমায় সেলিম না করিয়া যদি সের আফগান করিতে?"

পাঠক, হাসিও না। সত্যই এমনই হয়। ইহারই নাম দুজ্জের্য় মানব-প্রকৃতি!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এমন ষড়যন্ত্র কি একটা হইয়াছিল? সের আফগান্‌কে কৌশলে হত্যা করিবার নানারূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। শিকারের ফল ত আশানুরূপ হইল না,—অগত্যা সেলিম আর এক উপায় স্থির করিলেন। স্থির করিলেন, কৌশলে হস্তিপদতলে ফেলিয়া সের আফগান্‌কে মারিতে হইবে।

তা সেলিম ত নানারূপ ফিকির-ফন্দি করিতে-ছেন;—রাত দিন আপন মনে নানা মতলব আঁটিতেছেন; কিন্তু সের আফগান মরে কৈ? রাজাধিরাজ—ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি;—কৈ, শত চেষ্টায়ও ত তিনি একটা লোককে মারিতে পারিতেছেন না?

বলিবে, গোপনে,—গুপ্ত উপায়ে বলিয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না।—কিন্তু কথাটা কি ঠিক? গোপনে না হইয়া প্রকাশ্যে হইলেই কি উহা সহজ-সাধ্য হইত? না, তা নয়। মানুষ নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না,—যদি বিধাতার ইচ্ছা না হয়।

প্রতিহিংসা-পরায়ণ সেলিম এক মাহুতকে গোপনে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন, "সের আফগানকে কৌশলে হস্তিপদতলে ফেলিয়া পেষিয়া মারিতে হইবে। সে যেন কিছুতে না বুঝিতে পারে যে, এ কার্য্যে আমার যোগ আছে। কার্য্য শেষ করিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কৃত হইবে।"

মাহুত প্রলুব্ধ হইয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত একার্য্যে সম্মত হইল। সে সর্ব্বদাই সম্রাটের পাপ-অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কৈ, সম্পূর্ণ সুযোগ ত আর মিলে না?

সেলিম দেখিলেন, দিনের পর দিন যাইতেছে, মাহুত কিছুই করিতে পারিতেছে না। তখন

তিনি নিজে সংগোপনে সের আফগানের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

উপর্য্যুপরি কয়দিন লক্ষ্য করিলেন, সের আফগান শিবিকারোহণ করিয়া এক সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র পথ দিয়া, সাধারণ স্নানাগার হইতে স্নান করিয়া আইসেন। স্বার্থজ্বালা-প্রপীড়িত, হিংসাবিষ-জর্জ্জরিত, নীচাশয় সম্রাটের মনে হইল,—এই উৎকৃষ্ট সুযোগ;—মাহুতকে শিক্ষা দিই,—কল্য এই সুযোগে হতভাগ্যের প্রাণবধ করিবে।”

তাহাই হইল। পরদিন যথাকালে সের আফগান স্নানাগার হইতে স্নান করিয়া শিবিকা-রোহণে ফিরিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, অদূরে এক মহাকায় হস্তী, কিছুতে দৃক্-পাত না করিয়া, অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে সেই ক্ষুদ্র-পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। দেখিলেন, সেই হস্তীর স্কন্ধোপরি এক নীচজাতীয় হিন্দু মাহুত বসিয়া আছে;—সে যেন ইচ্ছা করিয়াই হস্তীকে জোরে চালাইয়া আসিতেছে। দেখিলেন, আর মুহূর্ত্তপরেই সেই মহাকায় বলিষ্ঠ বারণ,—শিবিকা-সমেত তাঁহাকে পদদলিত করিয়া যায় এবং সেই

সঙ্গে হতভাগ্য বাহকগণও মারা পড়ে। তিনি ত্রস্তভাবে, উচ্চকণ্ঠে মাহুতকে কহিলেন, "থাম, একটু অপেক্ষা কর,—আমরা পার হইয়া যাই।" কিন্তু দুষ্ট মাহুত সে কথা শুনিয়াও শুনিল না,—আপন মনে হস্তী চালাইতে লাগিল। সের আফ-গান মনে করিলেন, "এ আর কিছু নয়,—হিন্দু মুসলমানে যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে,—এই পাপিষ্ঠ মাহুত এখন সুযোগ বুঝিয়া, সেই শত্রুতা-চরণ করিতেছে।" অগত্যা তিনি বাহকগণকে দ্রুতপদে শিবিকা লইয়া, পূর্ব্বকথিত স্নানাগারে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তখন এমন সঙ্কটকাল উপস্থিত এবং সময় এত অল্প যে, বাহকগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, সেই সঙ্কীর্ণ-পথে শিবিকা ফেলিয়া রাখিয়া,প্রাণভয়ে পলাইল। নিরুপায় সের তখন কটিদেশ-বিলম্বিত তীক্ষ্ণধার অসি গ্রহণ করিয়া অসীম সাহসে, সেই মহাবল হস্তীর গতিরোধার্থ অটলভাবে দাঁড়াইলেন। এই অসি সের আফগানের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। অসি ছাড়িয়া বীর কখন কোথাও যাইতেন না।—সেই প্রাণোপম অসি ক্ষিপ্রহস্তে পূর্ণবেগে ঝটিতি

সেই বিশাল হস্তীর বিশাল শূণ্ডে প্রহার করি-লেন। অব্যর্থ লক্ষ্যে, হস্তিশূণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূমে পড়িল। সেই সঙ্গে অশ্রান্ত শোণিতধারার সহিত, বিকট চীৎকার শব্দে, সেই বিশালকায় হস্তীও ভূপতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। দুষ্টমতি মাহুত হস্তিস্কন্ধ হইতে ভূপতিত হইয়াই, প্রাণভয়ে, চক্ষের নিমেষে তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

অদূরে এক প্রাসাদের ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া,—ভারত-সাম্রাজ্যের অধিনায়ক পাপিষ্ঠ সেলিম, এই নৃশংস অভিনয়ের আদ্যোপান্ত দেখিতে ছিল। যখন দেখিল, তাহার এ চেষ্টাও নিষ্ফল হইল, তখন গভীর দুঃখের সহিত একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল,

"হায়, এত করিয়াও এই দুঃসাহসী তুর্কীকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিতে পারিলাম না? নীচতা, কপটতা, নিষ্ঠুরতা যতদূর করিতে হয় করিলাম; কিন্তু কৈ, উদ্দেশ্য ত পূর্ণ হইল না? আর যে ধৈর্য্য থাকে না!—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর,—

কত কাল অতীত হইল,—আর ত মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিতে পারি না। এ দেহ অলস,—ইন্দ্রিয়-গ্রাম যে ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে!—সাধের যৌবনও যে ফুরাইয়া যায়!—আর কবে সে অনুপমা যুবতী ললনা লাভ করিব?—হা অদৃষ্ট! কেন বাদসাহের ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম লইয়া আমি জন্মগ্রহণ করিলাম? সের আফগান আজ কত সুখে সুখী!

"কিন্তু যাই হোক্, এ সুখ,—এ সৌভাগ্য তাহাকে আর অধিক দিন ভোগ করিতে দিব না।—না, নিশ্চয়ই না। দেখি, একবার স্পষ্টভাবে কুতবকে বলিয়া দেখি। কুতুব তার উপরিতন কর্ম্মচারী; তবুও সে তার হিংসা করে। তার গুণ-গরিমা দেখিয়া হিংসা করে। সদাই ভাবে, যদি সের আফগান তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। এই ঠিক;—এই সময়োচিত সৎযুক্তি।—কুতবকে দিয়া সের-ভল্লুককে নিহত করিতে হইবে। কৌশল করিয়া হতভাগ্যকে আরও কিছুদিন রাজধানীতে রাখিব। দেখি, এবার রাজাধিরাজের প্রবল পুরুষ-কার,—ভৃত্যের ক্ষুদ্র নিয়তিকে জয় করিতে পারে

কিনা ? দেখি, এবার রাজ-রাজেশ্বরের বামে জ্যোতির্ম্ময়ী মেহেরলুনেসা সুন্দরী শোভিত হয় কিনা ?”

যথাকালে সের আফগান সরলমনে সেলিমকে আত্মবিপদকাহিনী বিবৃত করিলেন, এবং যেরূপে সে বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাও আদ্যোপান্ত জানাইলেন। শুনিয়া, সেলিম যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।—তৎক্ষণাৎ রাজধানীর যাবতীয় হস্তিপরিচালকগণের বিরুদ্ধে পরোয়ানা বাহির করিবেন বলিবেন। সের তাহাতে বিনীত ভাবে আপত্তি করিয়া বলিলেন, “যে মন্দভাগ্য অন্যের অনিষ্টকামনায় গুপ্তভাবে কোন কার্য্য করে, সে চিরদিন কৃপার পাত্র। আমি সেই হত-ভাগ্য মাহুতকে সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষমা করিয়াছি ;—কেবল ঘটনাটি জাঁহাপনার গোচরে আনিলাম মাত্র।”

মুখমিষ্ট সেলিম তখন মুক্তকণ্ঠে সের আফ-গানকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, এবং সের যে অসীম সাহস ও বীরত্বের সহিত প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দিয়াছেন,—সমূহ বিপদে পড়িয়াও যে

অবলীলাক্রমে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন,—তজ্জন্য শত মুখে প্রশংসা করিলেন। সেলিমের প্রশংসাবাদের সহিত, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত চাটুকার উজীর-ওমরাহগণও সেরের গুণগান করিতে লাগিল। এতটা প্রশংসা,—এতটা গুণগানের উদ্দেশ্য এই যে, সরলচেতা সের আফগান যেন কিছুতেই আসল ব্যাপারটা অবগত হইতে না পারে। ইহাই বিদ্যামত্তা ও বুদ্ধিমত্তার একটা মস্ত পরিচয় ;—ইহাই সেলিম ও তৎসহচরগণের "রাজনীতির" একটা অঙ্গ !

উদার-চেতা সের আফগান নিজে যেমন সর্ব্বান্তঃকরণে নীচতাকে ঘৃণা করিতেন,—অন্যের জীবনও সেইরূপ নীচতাশূন্য,—ইহাই তাঁহার মনে হইত। তিনি প্রায়ই কাহাকে অবিশ্বাস করিতেন না। ইহার ফল,—এই টাকা-আনা-পায়ের সংসারে যাহাই হউক,—ইহাই কিন্তু মনুষ্যত্ব। যে এই মনুষ্যত্বকে জীবনের সম্বল করে, সে লাভ-লোকসানের খতিয়ান রাখে না,—রাখিতে পারে না। নিষ্ঠুর সংসারে অবশ্য এজন্য তাহাকে অনেক সময় ঠকিতে হয় ; সে ঠকা সত্ত্বেও কিন্তু

সে সুখী। সের আফগান সকলকে বিশ্বাস করিয়া নিজে ঠকুন, তথাপি তিনি সুখী। আর যাহারা তাঁহাকে ঠকায়, তাহারা জিতিয়াও অসুখী। এ কথাটা যিনি না মানেন, তিনি বুদ্ধিমান্ হইলেও সুবোধ নহেন;—আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিব না।

চিরসুখী সের আফগান আরও যে কিছুদিন রাজধানীতে ছিলেন,—স্বয়ং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ভারত-সম্রাট হইতে রাজপথের দীন হীন ভিক্ষুক পর্য্যন্ত,—সকলের সমান শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মান লাভ করিয়া,—সর্ব্বদা শান্তিতে থাকিয়া,—রাত্রে সুখে নিদ্রা গিয়া নিরুদ্বেগে ছিলেন। আর যাহারা তাঁহাকে ঠকাইবার মতলবে ফিরিতে লাগিল, তাহারা সর্ব্বদা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার সহচর হইয়া,—উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের হস্তে মনটাকে সঁপিয়া দিয়া,—রাত্রে নিদ্রা-সুখে বঞ্চিত হইয়া,—দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতে লাগিল।

অবশ্য সের আফগানের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা ত হইবেই। কিন্তু এই বহু পূর্ব্ব হইতে যাহারা নিমিত্ত মাত্র হইয়া মনটাকে নরকের তীব্র

উত্তাপে ঝলসিত করিয়া কষ্টে বাঁচিয়া আছে, তাহাদের কি লাভ ?

লাভ যে কি, তা তাহারাই বুঝে। তা তাহাদের সে বুঝা-পড়ায় আমাদের কাজ নাই ;—আমরা এইখানেই এ প্রস্তাবের ইতি করি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কুতব লোকটা কে, এবং তাহার কার্য্যের ফল কি হইল, এখন সেই কথাই বলিব।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান প্রতিনিধি,—সমগ্র বঙ্গরাজ্যের সুবা বা শাসন-কর্ত্তা,—এই কুতব। কুতব,—জাহাঙ্গীরের একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং প্রধান অনুচর। পদোচিত সারত্ব বা মহত্ত্ব তাঁহার ছিল না,—কেবল সম্রাটের সু-নজরে পড়িয়া, তিনি বঙ্গের শাসন-কর্ত্তার উচ্চ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সম্রাটের মনো-রঞ্জনার্থ অকার্য্য-কুকার্য্য করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না,—বরং তাহাতে সম্রাটের অধিক প্রিয় হইতে পারিবেন ভাবিয়া আগ্রহ সহকারে তাহা করিতেন। সেলিম কুতবের প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে

অবগত ছিলেন ; তাই নিজে না পারিয়া, সেই হীনমতি শাসনকর্ত্তাকে, কৌশলে, সের আফগান-নিধনে নিয়োজিত করিলেন।

নীচাত্মা কুতব প্রভুর মনোভাব অবগত হইয়া, গোপনে চল্লিশ জন ঘাতক নিযুক্ত করিল। ইহারা ব্যবসায়ী ঘাতক। ইহাদিগকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া এবং ভবিষ্যতে প্রচুর পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া কহিল, "যদি তোমরা সেই দুঃসাহসী—দুর্জ্জয় সের আফগানকে গোপনে হত্যা করিতে পার, তাহা হইলে, তোমাদের প্রত্যেককে এমন পুরস্কার দিব, যাহাতে তোমরা আজীবন সুখে কাল কাটাইতে পারিবে। কিন্তু সাবধান,—যেন ঘুণাক্ষরে কেহ আমার এ ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত না হয়।"

এই বলিয়া পাপিষ্ঠ সেই ঘাতকগণকে উপদেশ দিল,—"গভীর রাত্রে যখন সের আফগান আপন প্রকোষ্ঠে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইবে, তোমরা সেই অবসরে, সেই অসহায় অবস্থায় তাহাকে হত্যা করিও।"

ঘাতকগণ বিশেষ উৎসাহভরে এ কার্য্যে সম্মত

হইল। কুতব তাহাদিগকে আরও নানারূপ উপদেশ দিয়া, নানা ফিকির-ফন্দি বুঝাইয়া, সম্যক্‌-প্রকারে প্রোৎসাহিত করিল।

রাত্রি কাল। রাত্রি গভীরা। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। জীব-জগৎ সুপ্ত। সকলে বিশ্রাম-ক্রোড়ে সমাসীন। পিশাচ ও নিশাচরের প্রিয়কার্য্য সাধনের উপ-যুক্ত অবসর। পুণ্যাত্মা সাধুগণও যে এসময় কোন কার্য্য করেন না তাহা নহে,—তবে তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি স্বতন্ত্র।—তাঁহারা জীবের কল্যাণকর অনুষ্ঠান ব্যতীত ভীতিজনক কোন কার্য্য এসময় করেন না এবং কখনও করেন না। পিশাচ এবং নিশাচরগণ কিন্তু এসময় নির্ব্বিঘ্নে, মনের সাধে আপনাদের পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। আমরা এখানে যাহাদের বিষয় বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারা সেই পিশাচ।—পাপ কুতব-নিয়োজিত সেই চল্লিস জন নরঘাতী পিশাচ।—সংহারবেশে তাহারা নিদ্রিত সের আফগানের শিয়রে সমুপস্থিত।

এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে, এক সুরম্য পালঙ্কো-পরি, সুন্দর দীর্ঘ বপুঃ এলাইয়া, বক্ষঃ বিস্তৃত করিয়া,

সুখে ও নিশ্চিন্ত মনে সের আফগান গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন,—সেই চল্লিস জন ঘাতক নিঃশব্দে সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। দেখিল, দীপাধারে একটি দীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই অস্পষ্ট দীপালোক,—সেই সাহসী নিদ্রিত তুর্কীর মুখের উপর পড়িয়াছে। সে মুখে পূর্ণমাত্রায় শান্তি বিরাজিত। মুখখানি ঈষৎ হাস্তময়।—তাহাতে একাধারে মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ। কোনরূপ কুটিলতা বা দুশ্চিন্তার ছায়া সে মুখ মলিন করে নাই।—প্রশস্ত ললাটে মহত্ত্ব বিকশিত ;—তাহার একটিও রেখা শ্রীহীন, অস্পষ্ট কিংবা বিবর্ণ হয় নাই। মস্তক-উপাধানে একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ কোরাণ বিদ্যমান। বোধ হয়, ধর্ম্ম ও চরিত্রবলে বলীয়ান্ সেই বীর,—ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিয়া, ঈশ্বরের পবিত্র নাম লইয়া, কোন গম্ভীর বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই মুখে এমন দিব্যভাব ও পবিত্র জ্যোতি। তাই এমন প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে তিনি নিদ্রিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একখানি সূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্রে আবৃত ;—কেবল

মুখখানি উন্মুক্ত। সেই সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ডের ভিতর দিয়া তাঁহার শরীরের লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শান্তিরূপা নিদ্রা তাঁহার দেহ-সুষমাকে অধিকতর সৌন্দর্য্যময় করিয়াছে।

ঘাতকগণ নির্নিমেষনয়নে সেই শান্ত পবিত্র মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের সেই নির্ম্মম-কঠিন-হস্তধৃত সেই তীক্ষ্ণধার শাণিত ছুরিকা কম্পিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের সেই রুধির-পিপাসু অস্ত্র তাহাদের হাতের মধ্যেই অবরুদ্ধ রহিল। তাহারা অনিমেষনয়নে সেই নিদ্রাচ্ছন্ন অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষসিংহের নির্ম্মল মুখ-মণ্ডল অবলোকন করিতে লাগিল। যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি, সিদ্ধ মন্ত্রবলে, সহসা তাহাদের স্বাভাবিক কঠোরতাকে কোমল করিয়া দিল।—তাহারা পরস্পর পরস্পরের মুখ চাহিল।

কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাদের এ ভাব থাকিল না। ‘বিলম্বে কার্য্যহানি হইতে পারে’ ভাবিয়া, তাহা-দের মধ্যে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী সর্দ্দার ঘাতক, আপন তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, নিদ্রিত সের আফগানের গল-দেশে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

ক্ষিপ্রহস্তে, তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বিতীয় ঘাতক, সহচরের হাত ধরিল। ভয় ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া, কম্পিতকণ্ঠে, আবেগভরে কহিল,

"ক্ষান্ত হও,—মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর!—হায়, আমরা কি মানুষ?—এই একের বিরুদ্ধে আমরা চল্লিস জন সমবেত;—তথাপি ইহাকে জাগাইয়া আক্রমণ করিতে ভীত হইতেছি!—হায়, ধর্ম্ম কি নাই?"

"হায়, ধর্ম্ম কি নাই?"—এই শেষ কথাটা ঘাতকের মুখ দিয়া এমন ভাবে নির্গত হইল যে, সমগ্র গৃহ সে স্বরে কম্পিত হইল। দেওয়ালে-দেওয়ালে সে স্বর ঘুরিতে লাগিল। দ্বার, গবাক্ষ, গৃহ-ভিত্তি সে স্বরে কাঁপিয়া উঠিল। গৃহের শিখরদেশেও সেই স্বর পঁহুছিল। সেই গৃহ, গৃহস্থিত আসবাব; সেই শয্যা, শয্যাস্থিত সেই ধর্ম্মগ্রন্থ,—সকলে যেন চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া একাগ্র অন্তরে সেই স্বর-সঙ্গীত শুনিল। সহসা যেন সেই অস্পষ্ট দীপালোক দপ্ দপ্ জ্বলিয়া উঠিল।—অন্ধকার গৃহ যেন আলোক-মালায় উজ্জ্বলীকৃত হইল।

সের আফগান জাগ্রৎ হইলেন। সুখে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন, সহসা একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইয়া জাগ্রৎ হইলেন। দুঃস্বপ্ন দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই, ঘাতকের সেই "ধর্ম্ম কি নাই"—কথাটা কর্ণে বাজিল। তন্দ্রাবস্থাতেই তিনি তাহার উত্তর দিলেন,—"ধর্ম্ম অবশ্যই আছে।" উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাগরিত হইলেন। চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে প্রত্যক্ষ দুঃস্বপ্ন-সহচরগণ দণ্ডায়মান।—গৃহে অগণিত লোক। উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের নাম লইয়া, অমনি লম্ফ দিয়া, তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও তাহার বিস্ময় সম্পূর্ণরূপে অপনোদন হয় নাই। তিনি বিস্মিতভাবে কহিলেন,

"একি, সত্যই আমি নিদ্রিত, না জাগরিত? জাগ্রৎ দশায় কি আমি এ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি?—কে তোরা?"

সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী ঘাতক ব্যঙ্গচ্ছলে উত্তর দিল, "আমরা আস্‌মান হইতে আসিতেছি। সশরীরে তোমায় জেন্নতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।"

এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, সেই ঘাতক-

সর্দ্দার, উত্থিত শাণিত ছুরিকা, সের আফগানের সেই বিশাল বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

"বটে, এতদূর !"

এই বলিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে, দৃঢ় আকর্ষণে, সেই ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া, সে: ক্ষের নিমেষে, সেই অস্ত্রেই আততায়ীকে সংহার করিলেন।

দ্বিতীয় ঘাতক, যে ভাবাবেশে বলিয়া উঠিয়াছিল,—'ধর্ম্ম কি নাই ?'—সে, অস্ত্র ত্যাগ করিয়া একপার্শ্বে গিয়া, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সের আফগান তাহাকে লক্ষ্য করিলেন। কিছু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তখন বিস্ময় প্রকাশের সময় নয়,—শত্রুর শাণিত অস্ত্র তাঁহার প্রতি উত্থিত।

সের আফগান দেখিলেন, তিনি একাকী, শত্রুসংখ্যা অগণিত;—সকলের হস্তেই শাণিত ছুরিকা। ভাবিলেন, "এখানে দাঁড়াইয়া এ ক্ষুদ্র অস্ত্রে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর নহে।"

তিনি ঝটিতি তথা হইতে এক ফ দিয়া, পালঙ্কের বিপরীত দিকে, গৃহ-দেওয়াল পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অতি ক্ষিপ্রগতিতে সেই দেওয়াল-বিলম্বিত রুধির-পিপাসু,—আপন

প্রাণপ্রতিম সেই করাল উলঙ্গ কৃপাণ করে লইয়া, বিকট এক হুঙ্কার করিয়া, সাক্ষাৎ কৃতান্তবেশে, বজ্রগম্ভীরস্বরে আততায়ীগণকে আহ্বান করিলেন।

তাঁহার সেই সঙ্কল্পসিদ্ধ ভীষণ সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া, মুহূর্ত্তকালের জন্য ঘাতকগণের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহাদের মনে সাহস আসিল,—"ভয় কি, আমরা এত লোক থাকিতে, এই একটা লোকের প্রাণ লইতে পারিব না? বিশেষ, পাপিষ্ঠ আমাদের দলপতিকে নিহত করিয়াছে।—অতএব প্রতিহিংসা চাই।"

"মার্ মার্" রবে তাহারা সের আফগান্‌কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু স্থান অতি সঙ্কীর্ণ; বিশেষতঃ, সম্মুখে সেই পালঙ্ক ব্যবধান; তদুপরি সের আফগানের অদ্ভুত অসিচালনা। শিক্ষিত বীরের হস্তে পড়িয়া সেই অসি অবিশ্রান্ত-বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।—সে ঘূর্ণনে বুঝি অসির অস্তিত্ব লোপ পাইল। ঘাতকগণ সবিস্ময়ে দেখিল, যেন একটি সুপ্তোত্থিত পুরুষসিংহের হস্তে একটি যন্ত্র-বিশেষ, অবিশ্রান্ত গতিতে ঘুরিতেছে। তাহারা দেখিল, সের আফগান অচল

অটলভাবে, প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তির মত স্থির নিশ্চল হইয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন,—কেবল তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অর্দ্ধাংশমাত্র, একটি যন্ত্র-সংযোগে নক্ষত্রগতিতে ঘুরিতেছে।

তখন তাহারাও মরিয়া হইল। একে একে, দু'য়ে দু'য়ে, তিনে চারে,—জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া, তাহারা সের আফগানের সম্মুখবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা;—তাহারা পালঙ্ক পার হইতে-না-হইতে, সেই মহাপরাক্রমশালী বীরের সেই শাণিত কৃপাণের অব্যর্থ লক্ষ্যে খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল।—দেখিতে দেখিতে দশজন ঘাতক ধরাশায়ী হইল।

অবশিষ্ট ঘাতকগণ তখন দলবদ্ধ হইয়া, সেই মধ্য-ব্যবধান পালঙ্কখানি ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল। সের আফগান সেই অবসরে, আর দশজনকেও নিহত করিলেন।—গৃহে রক্তস্রোত বহিল। ঘাতক-রক্তে তাঁহার পাদদেশ রঞ্জিত হইল। সৌভাগ্য-বশতঃ, তাঁহার গায়ে একটুকু আঁচড়ও লাগিল না।

পালঙ্ক ভঙ্গ হইল। ঘাতকগণ উন্মত্ত হইয়া অতি বিশৃঙ্খলভাবে সের আফগানকে আক্রমণ

করিতে উদ্যত হইল। তখন প্রত্যেকেরই চেষ্টা হইল,—সেই-ই সেরের প্রাণহনন করিবে। ইহার ফলে হইল এই যে, সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে, রাশীকৃত শবদেহের উপর তাহারা হুটাপাটি করিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। আর সেই অবসরে সের আফ্‌গানও, অপেক্ষাকৃত সহজ আয়াসে, কাহাকে বা অতি সাংঘাতিক রূপে আহত করিলেন এবং কাহাকে বা একেবারে নিহত করিয়া ফেলিলেন।

অবশিষ্ট দশ বারোজন তখনও দাঁড়াইয়া। তাহাদের মধ্যে ছয়জন শেষচেষ্টা করিল; চক্ষের নিমেষে দুইজন গতাসু হইল;—দুইজন আহত হইয়া শবদেহে লুটাইয়া পড়িল। বাকী দুইজন বেগতিক বুঝিয়া, প্রাণভয়ে পলাইল।

অবশিষ্ট ঘাতক ভিড় ঠেলিয়া যুঝিতে যাইতেছিল; কিন্তু যাই দুইজন শিকার ছাড়িয়া পলাইল দেখিল, অমনি ভেড়ার পালের মত, যে কয়জন অক্ষত দেহে বর্ত্তমান ছিল, দৌড়িয়া সেই দুইজন পলাতকের সঙ্গ লইল, এবং চক্ষের নিমেষে কোথায় উধাও হইয়া গেল।

ঘোর নিশীথে, অর্দ্ধদণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে,

এই ভীষণ ভয়াবহ পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হইল।

সের আফগান দ্বার অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, অবশিষ্ট আততায়ীগণ সত্য সত্যই পলাইয়াছে ;—কেবল একজন মাত্র বহুক্ষণ হইতে একভাবে দেওয়ালে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া, বিস্ময়বিহ্বল হইয়া,নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। সের আফগান তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"তুমি কি চাও? তোমারও কি যুঝিবার সাধ আছে?—থাকে ত, প্রস্তুত হও।"

সে কোন উত্তর করিল না। একটু নড়িলচড়িলও না। একবার চোকের পলকও ফেলিল না। দেখিলে বোধ হয়, তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে কি না সন্দেহ।

সের, তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। যেন কি মনে হইল। করুণার্দ্র হৃদয়ে কহিলেন, "তুমি কে? কি চাও? কি জন্য তুমি এখানে এমনভাবে দাঁড়াইয়া আছ?"

কিন্তু তথাপি সে কোন উত্তর করিল না। বহু-

ক্ষণ সের আফগানকে এক দৃষ্টে দেখিয়া দেখিয়া, জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, সজল নয়নে দীনভাবে নতজানু হইয়া, অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া রহিল।

সের পুনরায় বলিলেন, "বেশভূষায় দেখিতেছি, তুমিও একজন ঘাতক। অথচ দেখিতেছি, বহু-ক্ষণ হইতে তুমি অস্ত্রত্যাগ করিয়াছ। ইহার কারণ কি?—সত্য করিয়া বল, তুমি কে? তোমার মুখ দেখিলে ত তোমায় ঘাতক বলিয়া মনে হয় না? তোমার চক্ষের দৃষ্টি ত ঘাতকের দৃষ্টি নয়!"

"প্রভু!"

বাষ্পরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে ঘাতক বলিল, "প্রভু, আমাকে ঘাতকের দলে দেখিয়াছেন, ঘাতক বলিয়াই মনে করিবেন। আমি আপনা হইতে ধরা দিতেছি;—আমায় যে শাস্তি হয় দিন!"

"রহস্য ত কিছুই বুঝিতেছি না।—তুমি এমন ভাবে আমার পানে চাহিয়া আছ কেন?"

"আপনাকে দেখিতেছি।"

"কি দেখিতেছ?"

"আমি এ জীবনে আর কখন এমন দেখি

নাই!—আপনার অদ্ভুত বী[illegible] দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।”

এই সময় সের আফগানের সেই দুঃস্বপ্ন-কাহিনী আদ্যোপান্ত মনে জাগিল। স্বপ্নে তিনি দেখিতেছিলেন, তাঁহার প্রাণবধ করিয়া তাঁহার প্রিয়তমা মেহেরল্‌নেসাকে বলপূর্ব্বক এক দস্যু ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে,—এক হিন্দু-যুবক সেই দস্যুকে শাসাইয়া বলিতেছে, “ধর্ম্ম কি নাই?”—‘ধর্ম্ম কি নাই,’—এই মধুর, মন্ত্রসিদ্ধ, উত্তেজনাময় বাক্যে তাঁহার দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিল;—সম্মুখে তিনি সংহারবেশে আততায়ীগণকে দেখিলেন।

এইবার সের আফগানের মনে হইল,—“স্বপ্নে যে হিন্দু-যুবককে আমি দর্শন করিয়াছি, এই ব্যক্তির আকৃতি অবিকল সেইরূপ!”

তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,

“আপনি যেই হউন,আজ আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আশা করি, ‘ধর্ম্ম কি নাই,’—এই মহাবাক্য আপনার মুখ হইতেই বাহির হইয়া থাকিবে। এবং এই মহাবাক্যের প্রত্যুত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি জাগ্রতও হইয়াছিলাম। নচেৎ

আজি গুপ্ত ঘাতকের গুপ্ত অস্ত্রে নিশ্চয়ই আমি প্রাণ হারাইতাম।—আপনি কে, কৃপা করিয়া আমায় বলুন। দেখুন, আপনাকে দেখিয়া ক্রমেই আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি।”

“আমি ঘাতক,—আপাতত এই পরিচয়ই আমার যথেষ্ট। ইহার অধিক আপনাকে যদি কিছু বলি, আপনার হয়ত তাহা বিশ্বাস হইবে না।”

সের আফগান সেই ঘাতককে স্নেহভরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন, “হাঁ, বিশ্বাস হইবে,—অবশ্যই বিশ্বাস হইবে। আপনি কে, দয়া করিয়া বলুন;—সত্য প্রকাশ করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। আপনি আজ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন;—কি দিয়া আপনার ঋণ-পরিশোধ করি বলুন।”

ঘাতক কি ভাবিল, বলিল, “ঋণ-পরিশোধ করিবেন? তবে করুন।—আপনি আমায় ক্ষমা করুন।—সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করুন।—তাহা হইলেই আমার ঋণ-পরিশোধ হইবে।—বলুন, আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন?”

"ক্ষমা ? আপনাকে ক্ষমা ?—আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিলেন,—আপনাকে ক্ষমা ?"

"আমাকেই ক্ষমা ! বলুন, আমার অপরাধ যতই গুরুতর হউক, আপনি ক্ষমা করিবেন ?—তবে আমি আত্মপরিচয় দিব।"

সের আফগানের বিস্ময় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তিনি সেই রক্ত-রঞ্জিত কলেবরে সেই খানে বসিয়া পড়িলেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যান্ত তাঁহার মনে জাগিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া, অনিমেষ নয়নে, তিনি ঘাতকের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ঘাতক কহিল, "আমি আত্মমুখে পাপ-কাহিনী বিবৃত করিব,—আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন, অঙ্গীকার করুন।"

সের বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "পাপ-কাহিনী ? ক্ষমা ?—আপনি কি পাপ করিয়াছেন যে, আমি ক্ষমা করিব ?"

"সে মহাপাপ।—আপনি ক্ষমা করিবেন, প্রতিশ্রুত হউন।"

এবার সের আর এতটুকুও ইতস্ততঃ না

করিয়া কহিলেন, "প্রতিশ্রুত হইলাম।—এখন আপনি কে, বলুন?"

"আমি একজন হিন্দু যুবক,—ঘাতক নহি।"

"ঘাতক নন,—তাহা আপনি না বলিতেই আমি বুঝিয়াছি।—আপনার সকরুণ মুখমণ্ডলই সে পরিচয় দিয়াছে।—কিন্তু আপনি হিন্দু যুবক?"

"হিন্দু যুবক।—আমি ব্রাহ্মণ।"

সের আফগানের স্বপ্ন-বৃত্তান্তে অধিকতর আস্থা জন্মিল। তিনি অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি হিন্দু যুবক? ব্রাহ্মণ?—তবে আপনাকে এ ঘাতক-দলে দেখিলাম কেন?"

"আপনাকে সতর্ক করিতে।"

"এ ঘাতক-দল কাহাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমার প্রাণসংহার করিতে আসিয়াছিল?"

"ক্ষমা করিবেন,—তাহা আমি বলিব না। তবে আপনি সতর্ক থাকিবেন,—যত শীঘ্র পারেন, রাজধানী ত্যাগ করিবেন,—এখানে অনেক দিন ধরিয়া আপনার বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত চলিতেছে।"

সের ভ্রূকুটী করিয়া একটু শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"আবার চক্রান্ত ?—চক্রান্তের মূল কারণ কি, আমায় বলিবেন ?"

"না, তাহাও বলিতে পারিব না ;—সে বিশ্বাস আমি হারাইব না।"

"ভাল, এখন আপনি কে, তাহা বলুন।"

"তাহা বলিতেছি। তাহা বলিব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। আপনার ক্ষমালাভের উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, পাপমুখে পাপ-কাহিনী ব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি।"

বলিতে বলিতে যুবকের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল, চোক ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। যুবক বলিলেন,

"আমার নাম সুরনাথ শর্ম্মা ; নিবাস বীরভূম অঞ্চলে। আমি আপনার সহধর্ম্মিণীর শৈশব-শিক্ষক ছিলাম। অনেক দিন ধরিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। তিনি বয়স্থা হইলেন,—বিবাহযোগ্যা হইলেন,—তখনও আমি তাঁহার শিক্ষা দিতাম। ক্রমে আমার মতিচ্ছন্ন হইল,—মনে পাপ বাসনা জন্মিল,—আমি——"

বলিতে বলিতে যুবক অধোবদনে নীরব

হইলেন। মহানুভব সের আফগান বলিলেন, "লজ্জিত হইবেন না;—আপনি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া যান।—তারপর?"

যুবক একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তার-পর,—কি বলিব, আমি পাগল,—রূপ দেখিয়া আমি উন্মত্ত,—আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না,—আমি গুরু-শিষ্যার সম্বন্ধ ভুলিয়া,—আপন অবস্থা ও জাতি-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া, মনে মনে সেই বালাকে আত্মসমর্পণ করিলাম।"

যুবক আবার নীরব হইলেন। সের—সহৃদয় সের স্নেহকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, "আপনি সঙ্কু-চিত হইবেন না,—যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অক-পটে বলুন। আপনি না বলিতেই আমি আপনার অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছি,—অধিকন্তু আপনাতে আমি আকৃষ্ট হইয়াছি জানিবেন।—তারপর কি হইল?"

"তার পর আমি আপন চিতা আপন হাতে সাজাইলাম। আগুন দেখিয়া পতঙ্গ যেমন আত্ম-প্রাণ আহুতি দেয়, আমিও তেমনি মনে মনে সেই অপরূপ রূপ-রশ্মিতে ঝাঁপ দিলাম। ঝাঁপ

দিবার ফলে পুড়িলাম বটে, কিন্তু ভস্মীভূত হইলাম না। অন্তরের অন্তরে তীব্র উত্তাপে ঝলসিত হইয়া, একদিন আমি তাঁহাকে সকল কথা জানাইলাম। আমার চিত্ত যে একান্ত অবশ, তাহা তিনি বুঝিলেন। বুদ্ধিমতী, দয়াবতী তিনি,—পূর্ব্ব হইতেই কতক কতক বুঝিয়াছিলেন,—আমার মুখে সবিশেষ শুনিয়া আরও বুঝিলেন। তিনি আমায় ক্ষমা করিলেন। ইহজন্মে তাঁহাকে পাওয়া আমার ভাগ্যে নাই বুঝিয়া,— [illegible] তাঁহাকে ভুলিব ভাবিয়া, আমি জন্মের মত তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম।”

সের সমস্ত শুনিলেন, চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন,—“অতি বিচিত্র কাহিনী! এরূপ অদ্ভুত চরিত্রের লোক আমি জীবনে দেখি নাই। আমি স্বামী,—আমার সমক্ষে এমন অম্লানবদনে এই কঠোর সত্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইল? এ লোক সাধারণ নয়। ইহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিব।”

প্রকাশ্যে বলিলেন, “ভুলিতে পারিয়াছেন?”

“আপনি নিজগুণে অভয় দিয়াছেন,—আপ-

নাকে সত্য বলিব, ইহজীবনে আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। পাপমুখে বলিব কি,—তিনি ভুলিবার নন। যে তাঁহাকে একবার দেখিয়াছে, সে আজীবন, আরাধ্য দেবতার ন্যায়, অন্তরের অন্তরে তাঁহাকে চির-জাগরূক রাখিবে। আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারি নাই;—সুতরাং পর-স্ত্রীর প্রতি মনে মনে আসক্তিরূপ যে পাপ, তাহা আমাতে বিশেষরূপ স্পর্শিয়াছে।—আপনি তাঁর স্বামী,—তাই অকপট অন্তরে, আপনার নিকট এই পাপ-কাহিনী ব্যক্ত করিলাম।—আপনি নিজগুণে আমায় ক্ষমা করুন।"

সের আফগান সমস্ত শুনিলেন। স্তম্ভিত হইলেন। এই অকপট উদারপ্রণয়ীর আত্ম-কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কহিলেন,

"আপনার আর কিছু বলিবার আছে?—আপনি কিরূপে এ ঘাতকদলে মিশিলেন?"

"আমি অনেক দিন হইতে আপনার সন্ধানে ফিরিতেছিলাম। নির্জ্জনে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আপনার নিকট হৃদয়ের গুরু-ভার নামাইব বলিয়া ফিরিতেছিলাম। রাজ-

ধানীতে আসিয়া দেখিলাম, আপনার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র হইতেছে। একদিন রাত্রে কসাই-পল্লী দিয়া আমি যাইতেছিলাম। বিদেশী পথিক দেখিয়া, অর্থের প্রত্যাশায়, সহসা একদল গুণ্ডা আমায় আক্রমণ করিল। তাহারা আমাকে ধরিয়া তাহাদের দলপতির নিকট লইয়া গেল। সেই দলপতি তখন সুরাপানে আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিল। তাহার সঙ্গে আরও দুই চারিজন ছিল। কথাপ্রসঙ্গে তাহারা পরস্পরের মধ্যে আপনার হত্যাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। যে উপায়ে আপনাকে হত্যা করিবে, তাহাও বলিল। আমি শিহরিলাম। আপনাকে কোন উপায়ে রক্ষা করিব ভাবিয়া, আমি স্বেচ্ছায় তাহাদের দলভুক্ত হইলাম। কৌশলে, দুই চারিদিনের মধ্যে তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিলাম। তারপর যাহা ঘটিয়াছে, আপনি অবগত আছেন।"

সের আফগান আপন মনে কহিলেন, "কে বলে স্বপ্ন মিথ্যা ?—কিন্তু মেহের, তোমার দশা কি হইবে ?"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "বুঝিলাম, আমার প্রাণ

রক্ষা করিতে, জগদীশ্বর আপনাকে এখানে পাঠা-ইয়া ছিলেন।—বিবাহের পর আমার স্ত্রীর সহিত আপনার আর সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

"না, সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে সত্য বলিব,—চর্ম্মচক্ষে সাক্ষাৎ হয় নাই বটে, কিন্তু মানসচক্ষে অহর্নিশ আমি তাঁহাকে দেখিতেছি। সেই অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, আমার অন্তরে বাহিরে সদাই জাগিয়া আছে।—এই মুহূর্ত্তেও জাগিয়া আছে!—বীরবর, সত্যই আমি উন্মত্ত.—নহিলে, আপনি তাঁর স্বামী,—আপনার সমক্ষে কোন্ মুখে, তাঁর প্রতি আমার এই ভাব, এই অবৈধ অনুরাগ জানাইতে সাহসী হইতেছি? দেখুন, মনের পাপই পাপ; আমি এই পাপভারে প্রপীড়িত। কি বলিব আর,—এ দেহ দুর্ব্বহ; জীবন ভারাক্রান্ত;—আপনি উন্নতমনা বীর-পুরুষ;—তাই আপনার নিকট নির্ব্বিকার চিত্তে মনোভাব প্রকাশে সাহসী হইলাম। বোধ করি, এতদিনে আমার মহাপাপের আংশিক প্রায়শ্চিত্ত হইল।—আপনি আমাকে সরলমনে ক্ষমা করি-লেন ত?"

সের আফগান সত্য সত্যই এই সরলপ্রাণ হিন্দু-যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,

"আপনি ত প্রত্যক্ষভাবে এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহার জন্য বারংবার আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন? আপনি না বলিলে ত কেহই আপনার এ কাহিনী জানিতে পারিত না?—বুঝিলাম, আপনি হৃদয়ে রাজা; তাই আপনি এরূপ অকপট বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও সরলচেতা। বুঝিলাম, প্রেমের মাধুর্য্যে আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ। এ সব ছাড়িয়া দিয়াও,—আজ আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন;—আপনার এ মহৎ কার্য্যের তুলনায় আমার ক্ষমা অতি ছোট বিষয়। আপনি অমূল্য হৃদয়গুণে আজীবন আমায় কিনিয়া রাখিলেন।—বলুন, কি দিয়া আপনার চিত্তবিনোদন করি?"

"আমার চিত্তবিনোদন?—আমি বড় দুঃখী,—আমাকে স্মরণ রাখিবেন।"

"আপনি চিরদিন আমার হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি পাইবেন।"

সুরনাথ অবাক্ হইলেন। দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু

মুছিয়া, মুখ উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম, আপনিই সর্ব্বাংশে মেহেরেল্‌নেসার উপযুক্ত।—তাঁহারই যোগ্য স্বামী আপনি।—কোন্ মূর্খ বিধাতার বিধানে দোষ দেয়?"

ক্ষণকাল দুইজনেই নীরব। দুইজনেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ। দুইজনেই মনে মনে দুইজনের নিকট পরাভব স্বীকার করিতেছেন।

মহানুভব সের পুনরায় স্নেহস্বরে বলিলেন, "আপনার আর কিছু বলিবার আছে?"

"আর? আর কি বলিব,—আমার——"

"কি বলিতেছিলেন, নিঃসঙ্কোচে বলুন। দেখুন, সত্য বা প্রেম পরিব্যক্তে আমি কোন নিষেধ-বিধি মানি না।—কি বলিতেছিলেন, বলুন?"

"আপনার সহধর্ম্মিণীকে বলিবেন, তিনিও যেন এ দুঃখীকে এক একবার স্মরণ করেন।—শৈশব-শিক্ষক, মহাদুঃখী, মহাপাপীকে যেন স্মরণ করেন।"

এই বলিয়া সেই উন্মত্ত যুবা, পুনরায় দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু মুছিয়া, আপন করাঙ্গুলি হইতে একটি গরলাধার অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া, সেই অঙ্গুরীয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,

"বলিবেন,—বীরবর! আমি উন্মত্ত,—আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিন,—বলিবেন, প্রেমের পাত্রাপাত্র নাই,—প্রেমে হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই,—প্রেমে গুরুশিষ্যা সম্বন্ধ নাই,—প্রেমে ধর্ম্ম কর্ম্ম, ইহকাল পরকাল, সমাজ সংসার বিচার নাই,—প্রেমে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সুখ দুঃখ, খ্যাতি কলঙ্ক জ্ঞান নাই;—তাই আমি সর্ব্বস্ব ভুলিয়া, জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। বলিবেন জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার স্বপ্নময়ী মোহিনী মূর্ত্তি আমি ধ্যান করিয়াছি। বলিবেন, তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে এ পৃথিবীতে কোন ঔষধ আমি পাই নাই;—তাই তাঁহারই প্রদত্ত উপহারে,—তাঁহারই অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন এই গরলাধার অঙ্গুরীয়ে,—তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে, আমি সকল জ্বালা জুড়াইলাম! বলিবেন, যদি জন্মান্তর থাকে, তবে পরলোকে আমি তাঁহার সহিত মিলিত হইব। বলিবেন, সেই আশায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিলাম।—আপনি ক্ষমা করিয়াছেন,—তাঁহাকেও সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে বলিবেন।"

বলিতে বলিতে চক্ষের নিমেষে, সেই রূপোন্মত্ত, প্রেম-বিহ্বল, নিরাশপ্রাণ যুবক,—সেই জহরৎ-পূর্ণ তীব্র গরলাধার অঙ্গুরীয় গলাধঃকরণ করিল এবং তন্মুহূর্ত্তেই বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, ইহজন্মের সকল জ্বালার হাত এড়াইল।

এই শোচনীয় দৃশ্যদর্শনে সের আফগান স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, সাগর-মিলনাকাঙ্ক্ষিণী বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি যেমন অপ্রতিহত,—এইরূপ উদ্দামশীল নিরাশপ্রণয়ীর মনের গতিও সেইরূপ অপ্রতিহত।—ইহারা সাধ করিয়া মরণ-পথে ছুটিবে বলিয়াই, সহস্র বিঘ্নবাধাসত্ত্বেও, প্রেমকে জীবনের সার করে।—সেই প্রেম বৈধ হউক আর অবৈধ হউক,—হিতকর হউক আর অহিতকর হউক,—তাহার ফলাফল বিচার না করিয়া, তাহাতেই আত্মসমর্পণ করে।

সের সত্য সত্যই স্তম্ভিত হইলেন। একটু দুঃখিতও হইলেন। এরূপ সত্যবাদী, সরলচেতা, নিরাশপ্রণয়ীর জন্য দুঃখিত হইলেন। তারপর উপস্থিত মুহূর্ত্তে, যে তাঁর প্রাণরক্ষা করিয়াছে, সেই-ই তাঁহার সমক্ষে, একরূপ অভিমানে

আত্মহত্যা করিল,—ইহা ভাবিয়াও দুঃখিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "হায়, রমণী-রূপলাবণ্য!"

আনুপূর্ব্বিক সকল ভাবিয়া সের অতিমাত্র বিস্মিতও হইলেন। আজিকার মত বিস্ময়ের রজনী তাঁহার জীবনে আর আসে নাই। তিনি যে দিক দিয়া দেখেন এবং যে বিষয় লইয়া ভাবেন,—সর্ব্বত্রই তাঁহার বিস্ময় চরমসীমায় উপনীত। ক্ষণকালের জন্য তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পদতলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; সেই উষ্ণ শোণিত স্পর্শে যেন তাঁহার চৈতন্য হইল। ঘাতকদলের সেই ষড়যন্ত্র তিনি স্মরণ করিলেন। শিহরিয়া উঠিলেন।—কেন তাঁহার প্রাণহত্যার জন্য এ ভীষণ উপায় অবলম্বন? কে তাঁহার প্রাণহন্তারক হইয়া এই ঘাতকদল নিয়োজিত করিল? কে এমন তাঁর শত্রু? সের, ললাটে হস্ত স্থাপন করিলেন, উন্মুক্ত বাতায়ন সমীপে দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন, মনে হইল,—"ইহার মূলেও কি মেহেরন্নেসার অপূর্ব্ব রূপশ্রী?"

সের সেই উন্মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া কিছু-ক্ষণ কি ভাবিলেন। মনে মনে বলিলেন,

"ইহার মূলেও কি মেহেরের অপূর্ব্ব রূপশ্রী?—হাঁ, আমার মনে হয়, দুর্ম্মতি সেলিম আজিও প্রিয়তমাকে ভুলে নাই। মনে হয়, আমাকে এইরূপে গুপ্ত ঘাতক-হস্তে হত্যা করিয়া পাপিষ্ঠ তাহার পথ পরিষ্কার করিত!—হায়, ইহাই কি সত্য? আমি সম্রাটের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তাহার বিনিময়ে এই পুরস্কার? হায়! তবে সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায় কোথায়?—তুমি রমণীর রূপ!——"

সের অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"হায় রমণীর রূপ! তুমিই সংসারে এত মহাপাপের সৃষ্টি করিতে পার? তবে তুমি সুন্দর কিসে?"

হাঃ হাঃ হাঃ রবে বিকট হাস্যে সহসা সেই প্রকোষ্ঠ প্রতিধ্বনিত হইল। চিন্তাপীড়িত সের শিহরিয়া দেখিলেন, একটা আহত ঘাতকের মুখে সেই বিকট হাস্য বিরাজ করিতেছে!

কেন?—অসুর যে হ্যাঁদুর দেব্‌তা!—সের আফগান যেন কলির ভীম!

৩য়। ভীম নয়,—কেচক।

৪র্থ। দূর মুখ্যু,—কেচকই বা হ'তে যাবে কেন,—সের আফগান হিড়ম্ব রাক্কোস।

৫ম। দূর্! রাক্ষস নয়,—খোক্কোস্।

৬ষ্ঠ। তা যদি ব'ল্লে, তো ও রাক্ষসও নয় খোক্কোসও নয়,—ও ঐ অম্‌নি একটা।

৭ম। নারে না, তোরা কি মিছে গোলমাল করিস্,—ও একটা মাম্‌দো ভূত।

৮ম। একটা মাম্‌দো ভূতের বাবার গায়েও অত জোর নেই,—দশটা মাম্‌দো আর দশটা দানা মিশে ঐ মূর্ত্তি হ'য়েছে।

এই সময় আর এক দল নাগরিক তথায় আসিয়া জুটিল। একজন বৃদ্ধাও তার নাতিকে কোলে লইয়া সেখানে আসিল। তৎপরে এক দল বালক আসিয়াও যোগ দিল।

বৃদ্ধা মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে বলিল, "বাবা, এমন দেখিনি গো দেখিনে, কাল রেতে আমি ঘুমুচ্চি, জান্‌লার কাছে কে এসে খনা-কথায়

ব'ল্লে,—'ওঁ বুঁড়ী, তোঁর ঐঁ কঁচি নাঁতিটেকে দেঁ,—নঁইলে তোঁর চুঁলশুদ্দু ঐ আঁস্ত মাঁথাটা কঁড়মঁড়িয়ে চিঁবিয়ে খাঁবো।”

আর একজন প্রবীণা স্ত্রীলোকও সেই সময় সেখানে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “ওগো সর্ব্বনাশ হ'য়েছে গো, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে,—বাদসার হাতীশালে হাতী নেই, ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই,—বেগমমহলে দাই নেই,—রং-মহলে বাঁদী নেই,—পুকুরে মাছ নেই,—ওগো, কিছু নেই গো কিছু নেই,—সব ঐ সব্বনেশে আফগানেটা গিলে খেয়েচে।”

সময় বুঝিয়া একজন বালক কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, “সেই জন্তেই বুঝি আমার চাচা এক-দিনের জ্বরে ম'রে গেল!”

একজন প্রবীণও সেই সুরে সুর দিল,—“আর সেই জন্তেই বা একমাস আগে আমার নানীকে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ ফুফুদের পুকুর-পাড়ে মেরে ফেল্লে?”

পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধাও সুযোগ বুঝিয়া বলিল,—“হ'বেও বা, নইলে খামকা আমার কব্‌লে

গাইটা বা আজ সকালে দড়ি ছিঁড়ে পালাবে কেন ?"

আর একজন বলিল, "ঠিক বলেচ, সেই জন্যেই আমার সাত বছরের পুরোণো বদ্‌নাটা আজ খপ্ ক'রে হাত থেকে প'ড়ে ভেঙ্গেচে।"

আড্ডাটা খুব জমিয়া গেল। আবার এক-দল স্ত্রীপুরুষ আসিয়া জুটিল।

বৃদ্ধ ফকির সকলকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া বলিল, "কিগো গেরেস্তগণ! তোমাদের পাড়ার খবর কি ?"

১ম। খবর আর কি বল্‌বো গো, কি বল্‌বো,—কিছু নেই গো, কিছু নেই! কাল রেতে একটা দম্‌কা বাতাসে আমার বিশ বছরের খান্‌কাটা প'ড়ে গেছে।

২য়। আর আমার গুম্‌টীটে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

৩য়। করিম চাচা স্বচক্ষে দেখেছে, ঐ আবাগের পুত সের আফগানে,—ডানা নিয়ে পরীদের সঙ্গে আস্‌মানে উড়্‌তে উড়্‌তে এই সব বিভ্রাট ঘটিয়েছে।

৪র্থ। আমার মিতে বলে, সে এই মাস্তর দেখে এলো, বাদসার ফোজ আজ চাদ্দিকে ঘাটী দিচ্ছে,—ঐ সর্ব্বনেশে কেমন ক'রে আবার আস্‌মান থেকে জমিতে নামে, দেখ্‌বে।

৫ম। না বাপ্‌,—সে মূর্ত্তি দেখ্‌লে আমার বিলু বিবীর পেট ফুঁড়ে ছেলে বেরুবে!

৬ষ্ঠ। ঠিক বলেচ, মেয়েছেলে সব আঁত্‌কে উঠ্‌বে।

৭ম। না না না, আয়ি বলেচে, বুকে শূল-বেদ্‌না ধর্‌বে।

৮ম। আমার দোস্ত গুণ্‌তে জানে। সে গুণে বলেচে, বেহেস্ত থেকে হুকুম এয়েচে, এক-দল জীন্ সের আফগান্‌কে কাঁধে নিয়ে এই সহর ঘুরে বেড়াবে।

৯ম। ও বাবারে! বলে কিগো!—তবে আয় সব, এ সহর ছেড়ে পলাই চ।

তখন সেই সমবেত জনতা সহসা পলায়নো-দ্যত হইল। সুযোগ বুঝিয়া ফকির সাহেব এক ফন্দি ঠাওরাইল্। বলিল, "গতিক বড় ভাল বুঝচি নে। সবাই মিলে এক কাজ কর। ঢাকি-ঢোল

বাজিয়ে খুব ঘটা ক'রে পীরের সিন্নী দাও। বল, না হয় আমি এই ভার নিই? আমার এই নুতন থানকাতে পরব হ'তে পারবে। বেশী নয়, কেবল সিন্নীর দরুণ জনা-পিছু স-পাঁচ-আনা পয়সা দিলেই চলবে।—বলি, ছেলে-পিলে নিয়ে ত চার-চাল বেঁধে থাকতে হ'বে!—পালিয়ে যাব কোথায়?"

এ প্রস্তাবে সকলে একরূপ নিমরাজী হইল। ফকির সাহেব বুঝিলেন, চালটা চালিয়াছেন ভাল, তবে নসীবে লাগিলে হয়!

ফল কথা, সের আফগান সংক্রান্ত ঘাতক-হত্যা ব্যাপারটা লইয়া, কিছুদিন ধরিয়া সহর পল্লী তোলপাড় হইতে লাগিল। জনে জনে নুতন নুতন গল্প রচিয়া, সকলের মনে ভীতি-বিস্ময়-কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল, সের আফগানকে দেখিবার জন্য লোকে ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত। তিনি যেন একটি অসাধারণ দর্শনীয় বিষয় হইলেন। সের আফগান পথে বাহির হইলে দলে দলে লোক দাঁড়াইত। সকলে ভয় বিস্ময় ভক্তিতে

তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিত। মাতা সন্তানকে আশী-র্ব্বাদ করিবার সময় সের আফগানের নাম গ্রহণ করিতেন। কাহারও বীরত্ব বা কোন বিষয়ের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার সময়, লোকে সের আফগানের উল্লেখ করিত। অতি অল্পদিন মধ্যে, সের আফগান সম্বন্ধে বিবিধ গল্প গীত দেশ বিদেশে প্রচারিত হইল। এইরূপে সেই অসাধারণ তুর্কী বীর আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সম্বন্ধে অতিরিক্ত বাহুল্য-ব্যাখ্যা এবং আজগুবি কাহিনী ক্রমে লোপ পাইয়াছিল; ক্রমে স্বাভাবিক গুণ-গৌরবে তিনি সর্ব্বত্র অতুল যশস্বী হইয়া ছিলেন।

তা এতটা বাড়াবাড়ি, এতটা খ্যাতি প্রতি-পত্তি,—সেলিমের ভাল লাগিল না,—একরূপ অসহ্য হইয়া উঠিল। শত্রুর গুণগান,—সর্ব্বত্র শত্রুর অগণিত প্রশংসা,—সেলিমের বিষ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার সকল চক্রান্ত, সকল ষড়যন্ত্র এইরূপে বৃথায় পর্য্যবসিত হইতেছে,—অধিকন্তু তাঁহার মহাবৈরী উত্তরোত্তর অধিকতর বীরত্ব দেখাইয়া লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অধিক-

তর লাভ করিতেছে,—বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় সেলিমের বুকে ইহা বিষম বাজিল। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায়, কথিত ঘাতক-হত্যা ব্যাপারেও সেরের বীরত্ব ও সাহসের সমধিক প্রশংসা করিয়া সেরকে প্রোৎসাহিত ও সম্মানিত করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে প্রতিহিংসার ঘোর কালানল সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন।—এবার দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি তাঁহার সেই প্রিয় অনুচর পাপ কুতবকে এক ভীষণ মন্ত্রণা প্রদান করিলেন।

এদিকে সেই প্রবল পরাক্রান্ত, অসীম সাহসী, জয়শীল তুর্কী বীর,—সকলের নিকট বিদায় লইয়া যথাদিনে আপন কর্ম্মস্থান বর্দ্ধমানে পঁহুছিলেন। তাঁহার মনে একটা প্রবল সন্দেহ-মেঘ উদিত হইল;—"হায়, আবার চক্রান্ত? আবার ষড়যন্ত্র?—জানি না, অদৃষ্টে কি আছে!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দুইটি চিন্তায় সের আফগান কিছু বিস্মিত ও উৎকন্ঠিত হইলেন। সেই বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা,—তাঁহার জীবন বড়ই ভারবহ করিল। প্রথম, মেহেরলন্নেসার রূপে উন্মত্ত সেই আত্মঘাতী ব্রাহ্মণ যুবকের বিষয় ও স্বপ্নসন্দর্শন; দ্বিতীয়, সেই নিশীথে গুপ্ত ঘাতক-সংক্রান্ত ভীষণ ব্যাপার। বিশেষতঃ সেই ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহাকে সতর্ক করিয়া গিয়াছে,—"আপনার বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত চলিতেছে।" সের আফগান্ ভাবিলেন,

"আবার চক্রান্ত কি? কৈ, আমি ত কখন কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই,—তবে আমার শত্রু কে? কৈ আমি ত জীবনে কাহারও বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করি নাই; তবে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবে কে?

"কিন্তু সেই সরলচেতা হিন্দু-যুবকের সেই অন্তিমবাণীও ত অবিশ্বাস করিতে পারি না? তিনি যে স্পষ্টই আমাকে সতর্ক হইতে বলিয়া গিয়াছেন? সেই কাল-নিশীথে গুপ্ত ঘাতক-অস্ত্রে তিনিই যে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন? তাঁহার কথা ত অবিশ্বাস করিতে পারি না? হায়, আমার বিরুদ্ধে কে সেই গুপ্ত ঘাতকদল নিযুক্ত করিয়াছিল? আমার এ প্রাণে কার কি প্রয়োজন? পৃথিবীর কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? কৈ, আমি ত কাহাকে পৈশাচিক উপায়ে হত্যা করি নাই,—তবে আমাকে কে সেই হীন কৌশলে নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছে? সাধারণ লোক ত কেহই আমার শত্রু নাই;—তবে এ চক্রান্ত করিতেছে কে? আমার অতুল্য সম্ভ্রমই কি তবে আমার শত্রু?—না, রূপবতী পত্নীর অপরূপ রূপই এই চক্রান্তের নিদান?

"তবে কি—হায়!——"

মর্ম্মপীড়িত সের একটি মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে কি হায়! রূপাতুর সেলিম আজিও অন্তরে অন্তরে মেহেরন্নেসার

রূপ-মাধুরী ধ্যান করিতেছে? তবে কি আজিও আমি ভারত-সম্রাটের প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী আছি! তবে কি সেই ভীষণ প্রতিহিংসা সাধন অভিপ্রায়ে সেলিমই এই চক্রান্তের অধিনায়ক হইয়াছে? হায় কি বুঝিব, দুর্জ্জেয় মানব-চরিত্র!—আমায় কে এই সমস্যা পূরণ করিয়া দিবে? সেই অকপট বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ যুবকের কথা কখনই মিথ্যা নহে। সে প্রেমপ্রবণ উচ্চ হৃদয়ে প্রতারণা স্থান পায় না; ব্রাহ্মণ যুবক যাহা বলিয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নীচাশয় সেলিম অথবা তাহার পাপ অনুচর কুতবেরই এই কাজ। আমার অন্তরাত্মাও যেন এই কথাই বলিতেছে! এই জন্যই কি কুতব সহসা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিল? এই জন্যই কি সেই পাপিষ্ঠ একদিন অত মৌখিক সৌজন্তে আমায় আপ্যায়িত করিয়াছিল? এই জন্যই কি সেলিম মুখে মধু—হৃদে বিষ লইয়া আমাকে অনুগ্রহের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হয়?—এ দুর্দ্দিনে কোথায় সেই দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরো বা! ওহো, আকবরের আসনে এই নীচাশয়, অধ-

মাত্মা, কাম-কুক্কুর স্থান পাইল?—হায়, সৃষ্টি! সত্যই তুমি অসম্পূর্ণ।

“মেহের, প্রিয়তমে মেহেরল্‌নেসা! কেন তোমার সহিত আমার মিলন হইল? কত লোকের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, নীরব অভিসম্পাৎ, নিরাশপ্রণয়ের মর্ম্মদাহ অনুক্ষণ আমায় ভোগ করিতে হইতেছে। ওহো, চক্ষের উপর সেই প্রেমোন্মত্ত, হতভাগ্য ব্রাহ্মণ যুবকের সেই করুণমূর্ত্তি দেখিতেছি!—সেই বিষাদমলিন মুখ আজিও সমান ভাবে আমার হৃদয়ে জাগিয়া আছে।—আমার প্রাণরাক্ষকারী, সেই অতি কোমল প্রকৃতি, অনুতপ্ত যুবক,—হায় মেহের! তোমার জন্যই আত্মঘাতী! প্রিয়তমে,—কেন বিধাতা তোমার দেহে এ স্বর্গীয় সুষমা দিলেন? কেন তুমি আমার হইলে?—যাহার জন্য সেলিম পাগল, যাহার জন্য উজীর-ওমরাহগণ আমার প্রতি বক্রদৃষ্টি, যাহার জন্য এত অনর্থ ও রক্তপাত,—যাহার জন্য এ ভীষণ ষড়যন্ত্র,—হায়, কেন তুমি তোমার সেই অতুল্য রূপ লইয়া এ দরিদ্রের হৃদয় আলোকিত করিয়াছিলে? কে জানিত, দুনিয়ার মালিক হইলেও

রূপ-তৃষ্ণা যায় না ? কে জানিত, অনন্ত ঐশ্বর্য্যও রমণী-প্রেমের নিকট তুচ্ছ ? কে বুঝিত, জগৎ-জোড়া সম্মান—অতুল্য পদ-গৌরব,—অত্যুচ্চ বংশাভিমানও মানুষকে রূপের নিকট অতি হীন প্রতিপন্ন করে ? আর কে ভাবিয়াছিল, জীবনের সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাকে এরূপ প্রবল প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বীর হিংসা, খলতা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে যুঝিতে হইবে ? আমার প্রাণের উপরও যখন পিশাচের কুটিলকটাক্ষ পড়িয়াছে,—তখন কে জানে, এ পৈশাচিক অভিনয়ের শেষ কোথায় ? কে জানে, ভারত-সাম্রাজ্যের পরিণাম কি ?”

নির্জ্জন এক কক্ষে বসিয়া, সের আফগান আপন মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন, এমন সময় দিক্ আলোকিত করিয়া,—মুখে হাসি ও হৃদয়ে স্বপ্ন লইয়া, রূপেন্দ্রাণী ভুবনমোহিনী মেহ-রন্নেসা, গজেন্দ্রগমনে সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। যেন কোন ছায়া-পথ-বিহারিণী সজীব প্রতিমা আফগানের বামে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে মাধুরিমময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শনে, মুহূর্ত্তের জন্য, আফ্‌গানের সকল চিন্তা বিদূরিত হইয়া। প্রেমপরি-

প্লুতস্বরে, সহধর্ম্মিণীর হাত ধরিয়া আফগান কহিলেন,

"প্রিয়তমে, তোমার মুখ দেখিলে আমার আর কোন চিন্তা থাকে না। কি জানি, ও অপূর্ব্ব মুখমণ্ডলে কি স্বর্গীয় মাধুরী মিশ্রিত আছে,—যাহা দেখিলে আমি আপনা বিস্মৃত হই। বুঝিলাম, এই মুখ দেখিয়াই সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ উন্মত্ত হইয়াছিল, এবং এই মুখ ভাবিতে ভাবিতেই সেই মন্দভাগ্য ইহজন্মের জ্বালা জুড়াইয়াছে! আর এই মুখের জন্যই ভারত-সম্রাট আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং হয়ত এই মুখের জন্যই গুপ্ত ঘাতকের নির্ম্মম কঠিন হস্তে কোন্ দিন আমায় মনুষ্য-জন্মের খেলা সাঙ্গ করিতে হইবে।—প্রাণাধিকে! কি বলিব, জীবনের অনেক সাধ আমার অপূর্ণ রহিয়া গেল!"

প্রেম-প্রতিমা মেহের স্বামীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,

"প্রিয়তমে, তুমি অকারণ চিন্তিত হইও না। দেখ, মানুষ আপন বুদ্ধিতে কিছু করিতে পারে না। মন্দমতি সেলিম ত চিরদিন তোমার প্রতি

শক্রুতাচরণ করিয়া আসিতেছে ? কিন্তু তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইয়াছে ? ক্ষতি কেহ কারও করিতে পারে না,—মানুষ নিজের ক্ষতি নিজে যত করে। হিংসা-জ্বালা-জর্জ্জরিত সেলিম তোমার অনিষ্টকামনা করিয়া নিজেই বিড়ম্বিত হইতেছে জানিও। সেই ঘোর নিশীথে, সম্পূর্ণ অসহায় নিদ্রিতাবস্থায় যিনি তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন,—যাঁহার প্ররোচনায় সেই মন্দভাগ্য হিন্দুযুবক তোমার শিয়রে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বনিয়ন্তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিও,— শত সেলিম—শত কুতবও তোমার কিছু করিতে পারিবে না। আমার দিন দিন কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, আমরা যতই ভাবিয়া মরি না কেন,—অদৃষ্ট, কাল ও ঘটনার সম্পূর্ণ সংযোগ না হইলে কোন কাজই সিদ্ধ হয় না। তবে কেন বৃথা ভাবনায়, দিন থাকিতে, দেহের স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা নষ্ট করি ?—প্রিয়তম, আমার অনুরোধ, তুমি যথানিয়মে আপন কার্য্য করিয়া যাও,—অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।”

প্রাণময়ী প্রণয়িনীর,—আশার এই অমৃত-

ময়ী বাণী শুনিয়া,—চিন্তাপীড়িত আফগান প্রকৃতিস্থ হইলেন। স্বাভাবিক উদারতাবশে তিনি আবার মানুষের মূঢ়তা ও ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া গেলেন। আবার পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্যে—তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল। আবার সেলিম ও কুতবকে সরল বিশ্বাসে মনে স্থান দিলেন। পৃথিবী আবার তাঁহার মাধুর্য্যময় বোধ হইল। মানুষকে আবার তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,

"প্রিয়তমা মেহেরের কথাই সার,—'ক্ষতি কেহ কারও করিতে পারে না,—মানুষ নিজের ক্ষতি নিজে যত করে।' আমি নিরর্থক অবিশ্বাস ও সন্দেহকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি। তাহার ফলে নিজে দাহ হইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিনের জন্য, সমগ্র সংসারকেও দাহ করিয়াছি।—আমার বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির সহিত আমার পারিপার্শ্বিক সকলেরই সুখশান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল।—সেই ব্রাহ্মণ যুবক ত কাহারও নামোল্লেখ করে নাই,—তবে আমি কেন অকারণ সেলিম ও কুতবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হই? কেন তাঁহাদিগকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষ-নয়নে দর্শন করি? মানুষকে

ঘৃণা করা অতি সহজ, পরন্তু তাহাকে আপনার ভাবিয়া হৃদয়ে স্থান দেওয়াই মহত্ত্ব।—বিশেষ সেলিম আমার প্রভু; প্রভুকে মনে মনে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করিলেও প্রভুদ্রোহিতার পাপ স্পর্শে;—অতএব এ হিসাবে, আমিই তাঁহার নিকট অপরাধী।—রাজধানীতে অনেকে অনেক মতলবে ফেরে;—ব্রাহ্মণ যুবক বোধ হয়,—তাহাদেরই কাহাকে উদ্দেশ করিয়া আমায় সতর্ক হইতে বলিয়া গিয়াছে।—আমি না বুঝিয়া, বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া,—সেলিম ও কুতবকেই অপরাধী স্থির করিয়াছিলাম।—এটি আমার ঘোর মানসিক দুর্ব্বলতা।—বেশ ত, রাজধানীতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, রাজধানীতে আর নাই যাইব?—কিন্তু এ সুদূর পল্লী,—আমার শাসনাধীন এই বর্দ্ধমানে,—আমি নিশ্চিন্তে শান্তিসুখে না থাকিব কেন?"

সদাশয় সের আফগান সকলই বিস্মৃত হইলেন। দুই দিনের দুশ্চিন্তা-জর্জ্জরিত অন্তর আবার তাঁহার সরস ও মধুময় হইল। প্রেমময়ী প্রণয়িনীর মধুর আশ্বাসে ও সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ন্যায়বিধানের সরল বিশ্বাসে, তিনি আবার আগেকার

সেই মানুষ হইলেন। বরং দুইদিনের বিশুষ্ক দুশ্চিন্তা,—এক্ষণে সরস সুচিন্তায় পরিণত হইয়া, তাঁহার জীবনকে অধিকতর শান্তিময় করিল।

এদিকে, স্বভাবের নিয়মবশে, সের আফগানের মানসিক দুশ্চিন্তা, আর একজনের হৃদয় অধিকার করিল। আর একজন অতি নিবিষ্ট মনে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া এবং তৎসহ ভবিষ্যতের একটি চিত্র কল্পনানয়নে অবলোকন করিয়া মনে মনে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। সে একজন,—সের আফগানের সেই প্রাণপ্রতিম পত্নী মেহেরলূনেসা। মেহের ভাবিতে লাগিলেন,—

"স্বামীকে সান্ত্বনা করিলাম বটে, কিন্তু জানি না, অদৃষ্টে কি আছে। হায়! আমার শৈশব-শিক্ষক,—সেই হিন্দু যুবা,—কেন মৃত্যুকালে স্বামীকে সতর্ক করিয়া গেলেন? সেই সতর্কতার মূলে কি আমি? তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—'আবার ঘোর চক্রান্ত চলিতেছে।' এ চক্রান্ত কি? কে এ চক্রান্তের নেতা? এ চক্রান্ত কি আমাকে লইয়া? মন যেন ঠিক এই কথা বলি-

তেছে। তবে এ চক্রান্ত সাধারণ নয় ;—এ চক্রান্তের নেতাও সাধারণ নয়। এ সকলই সেলিমের কৌশল। সেলিমের কৌশলেই সেই রাজকীয় শিকার,—নিরস্ত্র অবস্থায় ব্যাঘ্রবধে স্বামীর বীরত্ব প্রকাশ,—সেই মদোমত্ত হস্তিসংহারে স্বামীর সাহসব্যাখ্যান,—এবং তার পর সেই অগণিত গুপ্ত ঘাতকহস্তে ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার পরিত্রাণ ;—রাজ-বুদ্ধি সেলিম সৌজন্যের আবরণে এই সব পৈশাচিক অভিনয় করিয়াছে। দীর্ঘকাল রাজধানীতে থাকিয়া এবং পিতার মুখে রাজনীতির দুই একটা কূট সমস্যা শুনিয়া, আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে,—এ সকল চক্রান্তের মূলে সেলিমের পাপ লালসা বিদ্যমান। স্বামী আমার সরলচেতা উদারহৃদয় ;—তাই এ রহস্যভেদে অক্ষম হইয়াছিলেন। দু'দিনের জন্যও যে সন্দেহ মনে জাগিয়াছিল, তাহাও এখন তাঁর নাই। কিন্তু কি জানি কেন, আমার মন বলিতেছে—'এ চক্রান্তের পরিণাম শুভ নয়।' তাহা হইলে কি হইবে?—হায়, সে কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

"কিন্তু সেলিম কি সত্যই আমাকে আজিও ভুলিতে পারেন নাই? এই কত কাল অতীত হইল,—পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন ঘটিল,—আমি সন্তান গর্ভে ধরিলাম,—আমার মূর্ত্তি কি আজিও তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরূক আছে?—হা ঈশ্বর! কেন আমায় এ তীক্ষ্ণ রূপজ্যোতি দিলে? এ রূপের আগুনে আমি আর কতজনকে পোড়াইব? আমার জন্য সেই প্রেমপ্রাণ হিন্দুযুবা সর্ব্বস্ব ভুলিয়া জীবন আহুতি দিল; আর আমার জন্যই ভারতের অধীশ্বর আজ এই পিশা[illegible]কতি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই যে সেলিম স্বামীর প্রতি এত হিংসা করিতেছেন,—স্বামীর বিনাশসাধনে এত ষড়যন্ত্র করিতেছেন,—এ সকলের মূলেই আমি। তবে হায়, আমার বাড়া মন্দভাগিনী এ সংসারে আর কে? আমার জন্য একজন মরিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছে, আর একজন সাম্রাজ্যের [illegible]নিময়েও আমায়——থাক্,ও চিন্তা এখন ক[illegible] না। ওরূপ চিন্তা অন্তরে স্থান দেওয়াও পাপ। চিন্তা হইতেই বাসনার উৎপত্তি। বাসনাই পাপ। আমি পাপিনী। হাঁ, অন্তরে পাপিনী বৈ কি? কিন্তু

পাপিনী হই আর যাহা হই, আমি স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইব না। হায় রূপ! তুমিই যত অনর্থের মূল।—জগদীশ্বর! পরাধীনী রমণীদেহে এত রূপ দিলে কেন? দিলে যদি, তবে তার এত শত্রু কেন?”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সরলচেতা সের আফগান নিশ্চিন্ত মনে যথাবিহিত রাজকার্য্য করিতেছেন,—মনে কোনরূপ বিকার বা অবিশ্বাস নাই,—এমন সময় হঠাৎ এক দিন বঙ্গের প্রধান শাসনকর্ত্তা কুতব,—সম্রাট-সভার কয়েকজন বিশিষ্ট উজীর-ওমরাহকে সঙ্গে লইয়া, মহা সমারোহে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রীতিমত একদল অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ এবং অনুচর প্রভৃতিও ছিল। ঠিক যেন একটি ছোটখাট দেশ জয় করিতে, তিনি যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি, স্বয়ং সম্রাটের ঐরাবততুল্য প্রকাণ্ড হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সম্মুখে বিরাজিত; উজীর ওমরাহগণ তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া হাওদার শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

সংবাদ পাইয়া সের আফগান কিছু কৌতুহলী ও আনন্দিত হইয়া, অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন। আবাসবাটীর অনতিদূরে নিজে গিয়া অভ্যর্থনাদি করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে আনিবেন,—এই ভাবিয়া সহাস্যবদনে অগ্রসর হইলেন। গিয়া দেখিলেন, তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী কুতব ও গণ্যমান্য উজীর-ওমরাহগণ, প্রকাণ্ড রাজ-হস্তি-পৃষ্ঠে আসীন হইয়া, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পরস্পরের সাক্ষাৎ-সন্দর্শনে পরস্পর যথেষ্ট আপ্যায়িত ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সের আপন স্বভাবসুলভ সরলতা ও শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আজ আমার সুপ্রভাত! বহু প্রার্থনার ধন অপ্রার্থিত ভাবে গৃহে বসিয়া আজ আমি লাভ করিলাম!—আমার পরম সৌভাগ্য যে, একযোগে আপনাদের সকলকে একস্থানে পাইলাম। চলুন, দীনের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া দীনকে অনুগৃহীত ও সম্মানিত করিবেন।"

তারপর তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী কুতবকে একটু বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া জনান্তিকে

কহিলেন, "রাজ্যের সব কুশল ত? বাদসাহের শরীর-গতি ভাল?—তার পর, কি মনে করিয়া এ লোকজন সমভিব্যাহারে মহাশয়ের বর্দ্ধমান আগমন?"

কুতব,—পাপ কুতব ভীষণ দুরভিসন্ধি মনে রাখিয়া, মৌখিক সৌজন্য দেখাইয়া বলিল, "বহু-দিন হইতে মানস ছিল,—সমগ্র বাঙ্গলা মুলুকটা একবার নিজের চক্ষে পরিদর্শন করিয়া বেড়াইব। মধ্যে মধ্যে এরূপ তত্ত্বাবধারণ না করিলে রাজ্যের স্থায়ী উন্নতি হয় না। তাই প্রকৃত পদজনোচিত আড়ম্বরে দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি। বর্দ্ধমান বাঙ্গলার প্রধান রাজধানী,— তাই সর্ব্বাগ্রে বর্দ্ধমান পরিদর্শনে আসিয়াছি।"

"অতি উত্তম সঙ্কল্প,—রাজ-প্রতিনিধির যোগ্য বিবেচনা বটে।"

সের, কুতবের সদুদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

পাপ কুতব মনে মনে বলিল, "না, আর বিলম্ব নয়,—প্রকটমূর্ত্তি পরিগ্রহ করি।"

পাপিষ্ঠ পার্শ্ববর্ত্তী এক অনুচরকে কি ইঙ্গিত

করিল। সে অনুচর পূর্ব্ব হইতে যথাযথ পরামর্শ পাইয়াছিল। সেও নীরবে সেই ইঙ্গিতের পোষকতা করিল। অমনি উজীর, ওমরাহ, সৈন্যাদি সকলের মধ্যেই,—বিদ্যুদ্গতিতে সে ইঙ্গিতাভাষ প্রচারিত হইল। সকলেই নীরবে, নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে প্রস্তুত হইল।

মহানুভব সের উপস্থিত দুরভিসন্ধির বিষয় কিছুই না বুঝিয়া, হৃষ্টমনে পুনরায় সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,"তবে চলুন, দরিদ্রভবনে সকলে একবার পদার্পণ করিবেন। তথায় বিশ্রামাদির পর যথাকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।"

সকলে সম্মতিভাব প্রকাশ করিলে, সের প্রফুল্ল হৃদয়ে পুনঃ সংবর্দ্ধনা করিয়া আপন অশ্বে আবাসাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অভ্যাগতগণও তাঁহার অনুসরণের ভান করিলেন। সের অতি অল্পদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় কুতব পূর্ব্বোক্ত সেই অনুচরকে আবার কি ইঙ্গিত করিল। এবার সেই অনুচর একটু দ্রুতবেগে অশ্ব পরিচালন করিয়া, যেন অনাবধানে, একেবারে সের আফগানের গায়ের উপর গিয়া পড়িল।—

তারপর ঝটিতি কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে অথচ ঈষৎ কম্পিতহস্তে সেই অসি সেরের বিরুদ্ধে উত্তোলিত করিল।

চমৎকৃত সের, মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন সমস্ত বুঝিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার অতীতের সকল স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার সেই ব্রাহ্মণ যুবকের সতর্কতার কথা মনে পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার সেই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত হৃদয়ে জাগরিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রণয়িনী মেহেরল্‌নেসার অপরূপ রূপ-মাধুরী, সেলিমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উজীর ওমরাহগণের হিংসা এবং উপস্থিত কুতবের এই ঘৃণিত কৌশল ও হীন চক্রান্ত মনে জাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য মনুষ্যজীবনের ঘোর আত্মবঞ্চনায় ও দারুণ নীচতায় তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তখন এ সকল চিন্তার বিন্দু মাত্র অবসর তাঁহার নাই,—বিদ্যুতের আলোক যেমন এক লহমার মধ্যে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত স্পর্শ করে,—লহমার মধ্যে সের আফগানের মনেও এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ চিন্তার লহরী স্পর্শ করিল।

তখন তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া, এই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত প্রতিফল দিতে মনস্থ করিলেন, এবং চক্ষের নিমেষে কোষ হইতে আপনার সেই তীক্ষ্ণধার অসি গ্রহণ করিয়া, অব্যর্থ লক্ষ্যে আক্রমণকারীকে ইহলোক হইতে বিদায় দিলেন।

তখন তিনি কোপ-প্রজ্বলিত সিংহের ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া দেখিলেন, সমবেত উজীর ওমরাহ ও সৈন্যগণের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িয়াছে। —সকলেই অব্যর্থ লক্ষ্যে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইতেছে।

ক্রোধে, ক্ষোভে ও ঘৃণায়,—সর্ব্বাগ্রে তিনি এই হীন ষড়যন্ত্রের নায়ক,—পাপ কুতবকে পশুর ন্যায় নিহত করিতে মনস্থ করিলেন। মনস্থ মাত্রেই তিনি দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া রাজহস্তীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবং একটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই হাতীর হাওদা কাটিয়া ফেলিলেন।

তিনি একাকী, অথচ গজারোহী—দশ-পনেরো জন এবং সৈন্য-সামন্তাদির ত কথাই নাই,—এত

লোক সত্ত্বেও তাঁহাকে বাধা দিতে কেহ সক্ষম হইল না।—বীরের বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া, কাপুরুষগণ স্তম্ভিত হইয়া জড়-নেত্রে চাহিয়া রহিল। সেই অবসরে তিনি গজের সম্মুখীন-হইয়া, হাওদা কাটিয়া, অবলীলাক্রমে সেই সম্মুখোপবিষ্ট কাপুরুষ-নায়ক পাপ কুতবকে আক্রমণ করিলেন;—তাহার টুঁটি ধরিয়া গজপৃষ্ঠ হইতে ভুমে নামাইলেন; এবং তার[illegible] তার মুখে পদাঘাত করিয়া ঘৃণাস্বরে বলিলেন,

"অধম, নারকী, ক্রীতদাস, প্রবঞ্চক-কুক্কুর! তোর এই কাজ? সেলিম ছাড়া আর একজন রাজা আছে, তা কি মনে নাই? [illegible]রিতে হইবে,—চিরদিন পৃথিবীতে থাকিতে আ[illegible]স নাই,—আর একজনের কাছে জবাব-দিহি করিতে হইবে,—তাহা কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ? বিশ্বাস-ঘাতক, তোর পাপ অভিসন্ধি পূর্ণ হইবার অগ্রে,—আয়, তোকে জাহান্নবে প্রেরণ [illegible]রি!—তারপর আমার অদৃষ্টে যাহা আছে [illegible]বে।"

বলিতে বলিতে তেজস্বী আফগান সেই করাল কৃপাণ অতি প্রবলবেগে কুতবের বক্ষে

বিদ্ধ করিলেন ; হতভাগ্য কুতব তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল।

মৃত্যুকালে কুতব—"প্রতিহিংসা," "মেহেরল্‌-নেসা," "রাজ-আজ্ঞা" এইরূপ কয়েকটি সাঙ্কেতিক বাক্য উচ্চারণ করিল। [illegible] তখন উত্তেজিত হইয়া একযোগে সের আফগানকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সুকৌশলী যুদ্ধবীর সের অতি অপূর্ব্ব কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া,—অব্যর্থ লক্ষ্যে, চক্ষের নিমেষে পাঁচজন বিশ্বাসঘাতক আমীরকে ধরাশায়ী করিলেন।

পথে রক্ত-নদী বহিল। মনুষ্য-রক্তে পথ কর্দ্দমাক্ত হইল। প্রকাশ্য দিবালোকে, প্রকাশ্য রাজপথে এই ভীষণ ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধ-সজ্জা দেখিয়া, পথিক পথত্যাগ করিল ; বিপণিস্বামী—দোকানপাট বন্ধ করিল ; গৃহস্থগণ সভয়ে দ্বাররুদ্ধ করিয়া রহিল।

সের আফগান দেখিলেন, তিনি একাকী,—শত্রুসংখ্যা অগণিত। বুঝিলেন, এ যাত্রা প্রাণরক্ষা—অসম্ভব। সুতরাং তিনি প্রাণের মমতা ছাড়িলেন, আশা হারাইলেন, উন্মত্ত হইলেন।

তখন সেই নিরাশ-উন্মত্ত বীর,—অদ্ভুতপরাক্রমে একাকী সেই অগণিত শত্রুর সহিত যুঝিতে লাগিলেন। সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, যাহাকে পাইলেন,—বিকট হুঙ্কার রব করিতে করিতে, চক্ষের নিমেষে তাহাকেই নিহত করিলেন।

হতাবশিষ্ট আমীরগণ সেরের সে ভীষণ সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া, প্রাণভয়ে পশ্চাৎপদ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যসামন্তগণও হটিয়া আসিল। সের আর পুনরাক্রমণ না করিয়া,—সেই খানে দাঁড়াইয়াই, সিংহগর্জ্জনে কহিলেন, "আয়, যাহার সাধ থাকে, মরিতে আয়!—বীরের ন্যায় অসি-যুদ্ধ করিতে করিতে স্বর্গে যাইবি আয়!"

কিন্তু কুতব-সহচরগণ,—সেরের সাহস ও বিক্রম দেখিয়া,—ভীত, স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়াছিল। তাহারা যে এক এক জনে, কেবল মাত্র অসি বা বল্লম লইয়া সেরের সম্মুখীন হইবে, সে সাহস কাহারও হইল না। তখন এক আমীর পরামর্শ দিল,—"আর সম্মুখে নহে,—এই দূর হইতে তীক্ষ্ণ বিষাক্ত তীর ও গোলা ছুড়িয়া এই

দুর্জ্জয় পাপিষ্ঠের প্রাণসংহার করিতে হইবে।—সৈন্যগণ, আর বিলম্ব নয়।"

তখন একেবারে চারিদিক হইতে অশ্রান্তধারে তীর ও গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। একটা প্রকাণ্ড গোলা গিয়া—সের আফগানের অশ্বের মস্তকে পড়িল। অশ্ব ভূপতিত হইয়া প্রাণ হারাইল।

অশ্বের পতনের পূর্ব্বেই সুকৌশলী সের অশ্ব হইতে লাফাইয়া ভূমে পড়িলেন।

যেমনি বীর অশ্বচ্যুত হইলেন, অমনি চারিদিক্ হইতে পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যসামন্তাদি গিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। তখন অদম্য সাহসী সের অদ্ভুত কৌশলে ও প্রচণ্ড পরাক্রমে অসিচালনা করিতে করিতে পথ পরিষ্কার করিলেন।—অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি বহু আততায়ীর প্রাণসংহার করিলেন, এবং কতকগুলাকে পদতলে পিষিয়া, মর্দ্দিয়া—সাংঘাতিক রূপে আহত করিয়া ফেলিলেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা,—সেরকে নিহত করে; কেন না, তাহা হইলে সম্রাটের নিকট হইতে স্বতন্ত্র—প্রচুর পুরস্কার

সে পাইবে। তাই হতভাগ্যগণ, প্রত্যেকে নানা উপায়ে সেরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বুঝিল, অসিযুদ্ধে কিংবা কেবলমাত্র বল্লম বা সঙ্গীন দ্বারা—সেরের প্রাণবধ করা—তাহাদের সাধ্যের অতীত।

তখন তাহারা আবার পশ্চাতে হটিয়া আসিল; এবং সকলে সমবেত হইয়া অশ্রান্তধারে তীর ও গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল।

সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতেছে; তিন চারিটা বিষাক্ত তীর শরীরে বিদ্ধ হইয়াছে; দুই একটা জ্বলন্ত গোলা দেহ ঝলসিয়া দিয়াছে;—তথাপি সের আফগান অকুতোভয়,—ধীর, স্থির, গম্ভীর। তথাপি,—সেই মৃত্যুমুখে দাঁড়াইয়াও চঞ্চলতাশূন্য। অবিকম্পিত কণ্ঠে, গম্ভীরস্বরে শত্রুকে আহ্বান করিতেছেন,—

"আয়, ধর্ম্মযুদ্ধ কর্।—আমি একাকী,—আমার সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ কর্! দূর হইতে বিষাক্ত বাণ বা গোলানিক্ষেপে পুরুষার্থ কি?"

কিন্তু বীরের সে বীর উক্তিতে—কেহ কর্ণপাত করিল না;—নীচাশয় আমীরগণ যেন তাহা

শুনিয়াও শুনিল না ;—যেরূপে যেমন করিয়া হউক তাঁহাকে প্রাণে মারিতে হইবে,—ইহাই সকলের একমাত্র লক্ষ্য হইল।

* * * *

* * * *

অশ্রান্তধারে গোলাবৃষ্টি হইতেছে ;—তীরে তীরে চারিদিক্ ছাইয়া গিয়াছে ;—প্রকৃতি অতি ভীষণ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে ;— বায়ুর বেগ স্থির হইয়াছে ;—শত শত জড়-চক্ষু নিমেষশূন্য স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ;—ঈশ্বরবিশ্বাসী মহানুভব সের আফগান মনে মনে বলিলেন,

"না, আর নয়। এখন যে কাজটি অবশিষ্ট আছে, তাহা সম্পন্ন করি।—হায়, রমণী রূপ-লাবণ্য!"

তখন সেই ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, অতুল তেজস্বী ও সাহসী বীর,—আপন বজ্রকরধৃত সেই শাণিত কৃপাণ দূরে ফেলিয়া,—ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের ন্যায় প্রশান্ত স্থির গম্ভীর ভাবে,—মুসলমানের পুণ্যতীর্থ মক্কা নগরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন।

এবং বৰ্দ্ধমানের ধূলিকেই পবিত্র মক্কার ধূলি মনে করিয়া—মাথায় দিলেন। এবং তার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তদ্গতচিত্তে সেই অন্তর্য্যামী জগদীশ্বরের মহিমা ধ্যান করিতে লাগিলেন। তারপর নির্ব্বিকার চিত্তে মনে মনে বলিলেন,

"হে দীন্,—হে দুনিয়ার মালিক! তোমার অসীম করুণাগুণে তুমি এই অজ্ঞান অধমাত্মাগণকে ক্ষমা কর। মায়ামোহে ইহারা বিভ্রান্ত;—ইহারা জানে না যে, কি কাজ করিল! হে খোদা,—হে আল্লা রোহিম! আমার বধরূপ অবৈধ কার্য্যে—যেন ইহারা নীরয়গামী না হয়।"

অকস্মাৎ সের আফগানের মুখে দিব্য জ্যোতিঃ ও স্বর্গীয় লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল,—মুখ অপূর্ব্ব হাস্যপূর্ণ ও আনন্দময় হইল। সেই হাস্য ও সেই আনন্দ, এবং সেই লাবণ্য ও সেই জ্যোতিঃ স্থির থাকিতে থাকিতে,—বিপক্ষ-পক্ষ হইতে একযোগে ছয়টি গোলা আসিয়া,—তাঁহার সর্ব্ব-শরীর ঝলসিয়া দিল। এবং তার পর——

তার পর যাহা ঘটিল, তাহাতে গৃহে গৃহে

হাহাকার উঠিল। শত্রুগণও অন্তরে অন্তরে শোকসন্তপ্ত হইল। মোগল-সাম্রাজ্য একজন প্রকৃত বীর, যোদ্ধা ও সাহসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে চিরদিনের জন্য হারাইল।

তখন সেই নির্লজ্জ, কাপুরুষ ওমরাহগণ জয়-ধ্বজা তুলিয়া,—সের আফগানের অন্তঃপুর অবরোধ করিল। এবং তথা হইতে বিনা আয়াসে সেরের জ্যোতির্ম্ময়ী জীবন-প্রতিমাকে হস্তগত করিয়া,—পাপ সেলিমের পাপ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিল।

মেহেরলন্নেসা দেখিলেন, পুরুষসিংহ স্বামী পরলোকগত;—এখন বলপ্রকাশ নিষ্ফল। তিনি বিনা চেষ্টায় ধরা দিলেন। বন্দিনী স্বর্ণ-বিহঙ্গী পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া দিল্লীতে নীত হইলেন। তাঁহার জীবন-নাটকের এক নূতন দৃশ্য-পট উত্তোলিত হইল। কিন্তু হায়! সে দৃশ্যপটে আমরা তাঁহাকে আর এক মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইব।

তৃতীয় খণ্ড।

সিদ্ধি—ভোগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সের আফগানের নিধনে সেলিম যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। যাহার জন্য এত চক্রান্ত, এত ষড়যন্ত্র, এত উদ্যোগ, এত আতঙ্ক,—সেই বীরকে যে নিহত করা হইয়াছে এবং তাহার নিধনান্তে যে তাহার বিধবা পত্নীকে হস্তগত করা হইয়াছে; ইহাতে সেলিমের সুখের আর সীমা রহিল না। তিনি সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, সের আফগান বিদ্রোহী হইয়াছিল।—গোপনে ভারতরাজ্যের উচ্ছেদ সম্বন্ধে নানা চক্রান্ত করিতেছিল, তাই তাহার এই দণ্ড হইল; এবং তাই তাহার বিধবা পত্নীকে অবরুদ্ধ করিয়া দিল্লীতে আনা হইল। কণ্টক দূর হইয়াছে,—পাপ জাহান্নমে গিয়াছে,—এখন তিনি

নিষ্কণ্টকে সিংহাসন ভোগ করিতে পারিবেন ;—রাজভক্ত প্রজাগণ নিরুদ্বেগে সংসার-ধর্ম্ম করিতে পারিবে ;—সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশৃঙ্খলতা বিরাজ করিবে ;—সেলিম এইরূপ নানা মুখরোচক কাহিনী দেশ-বিদেশে প্রচার করিয়া দিলেন।—পাছে কেহ তাঁহার প্রতি সন্দেহ করে ; পাছে সের আফগান নিধনরূপ ঘোর অবৈধ কার্য্যে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট ও উত্যক্ত হয় ; পাছে তাহার ফলে রাজ্য-মধ্যে বিদ্রোহ-অগ্নি জ্বলিয়া উঠে,—এই আশঙ্কায় সেলিম এই সম্পূর্ণ মিথ্যাকাহিনী দেশবিদেশে রটনা করিয়া দিলেন। ইহারই নাম সূক্ষ্ম "রাজনীতি।"

সাধারণ লোক চিরদিনই গড্ডালিকা-প্রবাহবৎ চলিয়া থাকে। অন্যের মুখের কথা ও সাময়িক প্রতিধ্বনিই জীবনের সম্বল করে। কোনরূপ চিন্তা বা আত্মমত তাহাদের নাই। তাহারা বুঝিল,—"হ'বেও বা ? সের আফগান বাহিরে সরল সাধুবেশে লোকের মন ভুলাইত ; আর ভিতরে ভিতরে এই সব মতলব আঁটিয়া রাজ্যের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইত। নহিলে, রাজাই বা খামকা

কেন তাহার বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠাইবেন ? হাজার হোক, রাজবুদ্ধি কিনা ?—মানুষটাকে চিনিয়াছিল ঠিক।”—বলা বাহুল্য, সের আফগানের প্রতি এতদিনের ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসা,—তাহারা এই ভাবেই বিস্মৃত হইল। এবং এই ভাবেই তাহারা সেলিমের বুদ্ধিচাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে দুষ্টবুদ্ধি সেলিম আর এক চাল চালিল। যে রূপসী মেহেরলূনেসার জন্ম তাঁহার এত প্রয়াস, এত যত্ন, এত উদ্যম,—সেই রূপসী আফগান-পত্নীকে সম্পূর্ণরূপে হাতে পাইয়াও, তিনি উপেক্ষা-ভাব দেখাইলেন। যেন কোথাকার সে কার কামিনী,—তার সহিত কোন সম্পর্কই নাই,—এই ভাব প্রকাশ করিলেন। এবং সেই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য,—আপনাকে নিঃস্বার্থ ও নিষ্পাপ প্রতিপন্ন হেতু,—সেই চির-বাঞ্ছিত ললনা-রত্নকে অন্তঃপুরে স্ত্রী-মহালের একটি নিকৃষ্টতম কক্ষে একরূপ অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিলেন। এমন কি, সুদীর্ঘকাল তাঁহার কোন খোঁজ-খবরও লইলেন না, কিংবা সেই বরাননীর

প্রতি যে তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি বা অনুরাগ আছে, তাহাও কাহাকে জানিতে দিলেন না। স্থূলবুদ্ধি দুই একজন উজীর-ওমরাহ ভাবিল,—"রাজা-রাজ্‌ড়ার খিয়াল বুঝা ভার। যার জন্য এত অনর্থ, এত হাহাকার, এত রক্তপাত,—তাকে হস্তগত করিয়া এখন কিনা যত বৈরাগ্য!"

সেলিম বাহিরে লোকসমাজে এই ভাবেই প্রতিপন্ন হইতে লাগিলেন। কেহ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, মেহেরন্নেসার প্রতি তাঁহার লালসা আছে। ইহা ব্যতীত মেহেরকে বন্দিনী করিয়া কষ্টে রাখার আর একটি কারণও তাঁহার ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যাহার স্বামীকে অতি অবৈধ নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করা হইয়াছে;—অধিক দিন অতিবাহিত হয় নাই,—চক্ষের সমক্ষে যাহার স্বামীর স্মৃতি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে এত শীঘ্র বশ করা সুকঠিন। বিশেষ, আফগান-পত্নী কিছু গর্ব্বিতা,—সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় তাঁহার প্রকৃতি কোমল নহে।—তিনি বড় অভিমানিনী; সে অভিমানের বেগও শীঘ্র কমিবার নহে।—

তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বলবতী; সহজে সে প্রতিহিংসা ভুলাইয়া দিবারও নহে।—এইরূপ এবং আরও অন্যরূপ নানা আশঙ্কা করিয়া সেলিম তাঁহার প্রতি বিশেষ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে মেহেরন্নেসার গর্ব্ব, তেজ, অভিমান, প্রতিহিংসা প্রভৃতি ক্রমেই মন্দীভূত হইতে পারিবে বলিয়া সেলিমের বিশ্বাস। অতঃপর সুযোগ বুঝিয়া সেলিম নির্ব্বিবাদে সে মহিলা-রত্ন লাভ করিবেন,—মনে মনে ইহাই স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন।

মেহেরন্নেসা দেখিলেন, সত্য সত্যই তাঁহাকে একরূপ বন্দিনী হইয়া সামান্য পরিচারিকার ন্যায় দীন ভাবে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে হইল। তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ দুঃখ বা মনস্তাপ হইল না। তবে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার অন্তরে এই একটা বড় কষ্ট রহিয়া গেল যে, কোন্ পাপে, কার অভিশাপে তাঁহার এই আকস্মিক সর্ব্বনাশ হইল? কোথায় জগৎ-বরেণ্য রূপ ও গুণ, আর কোথায় আজ দাসীমহলে দাসীদের সহিত অবস্থান! তিনি ভাবিলেন,

"জগদীশ্বর, তোমার লীলা-মহিমা বুঝিতে পারি, এমন সামর্থ্য আমার নাই। কিন্তু প্রভু, বলিয়া দাও, কি অবলম্বনে আমার দিন কাটিবে? সেই দেশ-মান্য, সম্ভ্রান্ত, বীরশ্রেষ্ঠ স্বামীকে হারাইয়া, কি লইয়া আমি পৃথিবীতে থাকিব? তেমন রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্,—তেমন তেজস্বী, নির্ভীক, সাহসী,—তেমন ধর্ম্মভীরু, উদার, উন্নতমনা পুরুষসিংহ,—কৈ, এ নরলোকে ত আর দৃষ্টিগোচর হয় না?—হায়, অদৃষ্ট-দোষে আজ আমি সেই স্বামি-রত্নে বঞ্চিত! যাহারা তাঁহাকে অতি নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত উপায়ে হত্যা করিল, আজি আমি তাহাদেরই আশ্রয়ে অবস্থিতা,—তাহাদেরই অনুগ্রহ-প্রার্থিনী! তাহাদেরই অনুগ্রহের উপর আমাকে বাঁচিতে মরিতে হইবে। হায়, প্রাণ কি কঠিন! এ দৃশ্য দেখিয়া ও এই সব ভাবনা ভাবিয়াও ঠিক সমভাবে আছে।—এতটুকু বৈলক্ষণ্য, এতটুকু তরঙ্গও তাহাতে নাই!

"স্বামীর আশঙ্কাই ঠিক হইল,—আমার এই ঘৃণিত রূপই তাঁহার কাল হইল। হাঁ, ঘৃণিত বৈ কি? যে রূপের জন্য তিনি নির্দ্দয় কসাই কাপুরু-

যের হস্তে জীবন আহুতি দিলেন; যে রূপের জন্য সেই শৈশব-শিক্ষক, সরলপ্রাণ হিন্দুযুবক আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন,—সে রূপের আবার বড়াই কি?—হা ঈশ্বর! আমাকে কুৎসিতা বন্য-নারী করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইলে না কেন? তাহা হইলে ত আর এত হাহাকার, এত রক্তপাত, এত জীঘাংসার মর্ম্মান্তিক অভিনয় দেখিতে হইত না? তাহা হইলে ত আজ সাম্রাজ্য জুড়িয়া নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিত না? এবং তাহা হইলে ত আজ আমাকে স্বামিহন্তার অনু-গ্রহ-শৃঙ্খল বুকে বাঁধিয়া দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিতে হইত না?

"বড় দুঃখে আজ মুখে হাসি আসিতেছে। শুনিয়াছিলাম, আমার অদৃষ্টে রাজ-যোগ ছিল। তা এই কি সে যোগের পরিণাম? রাজেন্দ্রাণী কি আজ দীনহীন কাঙালিনীর ন্যায় দাসীমহলে অবস্থিতা? ভারতের ভাগ্য-বিধাতার হস্তে যন্ত্র-পুত্তলির ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বন্দিনী হইব বলিয়া কি জ্যোতির্বেত্তা আমার সহিত চাতুরী করিয়া-ছিল? বিধাতাও কি উপহাসের নিষ্ঠুর কশাঘাতে

জর্জ্জরীভূত করিবার জন্য আমার মনে সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দিয়াছিলেন?—অথবা হায়! এমন চিন্তাই বা আমি অন্তরে স্থান দিই কেন? এক হিসাবে গণনা ত ঠিকই ফলিয়াছে?—রাজার ন্যায় সম্ভ্রম, জগৎ-জোড়া মান, বীর-সমাজে খ্যাতি, বিদ্বান্ গুণবানের নিকট যশঃ, আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা,—আমার স্বামি-ভাগ্য যেমন ছিল, কার তেমন হইয়াছে,—আর কেই বা আজ হায়, তেমন দুর্লভ সম্পদে বঞ্চিত? সুতরাং আমি ত সত্যই রাজেন্দ্রাণী হইয়া ছিলাম; কপালে অত সুখ সহিল না, তাই সে অমূল্য-নিধি চোরে চুরি করিল! সেলিমই সেই চোর; পাপ কুতব সেই চোরের সিঁদ-কাটী। সিঁদ-কাটী আপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে;—চোরের শাস্তি আজিও হয় নাই। বলিতে পারি না,—যদি জগদীশ্বর দিন দেন, তবে আমিই চোরের সে শাস্তি দিব।”

মেহের,—শোকসন্তপ্তা, সর্ব্ববিধ ভোগ-সুখে বঞ্চিতা মেহের আপনমনে দিবা নিশি এইরূপ চিন্তা করেন। অবিরল অশ্রুধারায় বক্ষস্থল নিষিক্ত করিতে থাকেন। সে বিষাদ-প্রতিমা

শোকে সমাচ্ছন্না;—তথাপি রূপের শিখা সমভাবে উদ্দীপিত—বুঝি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটু অধিক। শোকে সুন্দরি-বদন অধিকতর সুন্দর বোধ হয়। শোকসৌন্দর্য্যময়ী মেহের আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিরলে কালাতিপাত করিতে থাকেন। আর আপন জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বলিতে থাকেন,—"হায়! কান্দাহারের সেই ভীষণ কান্তারে কেন আমার মৃত্যু হইল না?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই রাজান্তঃপুর একটা বিলাসের কারখানা। যত প্রকার ভোগবিলাস আছে,— ইন্দ্রিয়লালসার পরিতৃপ্তির যত কিছু উপায় আছে, তাহা এইখানে সম্পন্ন হয়। যুবতী সুন্দরী বেগমগণের এখানে অবাধ অধিকার। সুন্দরীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার আধিপত্য আবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। পক্ষান্তরে, এই বিলাসভবনে, সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ও কোন কোন সামাজিক বিষয়ের বীজও অঙ্কুরিত হয়। প্রকাশ্য দরবারে কোনরূপ রাজ-আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, এখানে তাহার প্রথম আখড়াই হইয়া থাকে। এখানকার কর্ত্রী যিনি, এক হিসাবে তাঁহারই হস্তে রাজ্যের কল-কাটী থাকে। সম্ভ্রান্ত উজীর-

ওমরাহগণ মধ্যে মধ্যে এখানে যাতায়াত করেন। উদ্দেশ্য, কর্ত্রীর কৃপা লাভ। সে কৃপায় অনেকের অনেক অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

বুদ্ধিমতী মেহের এই স্ত্রী-প্রধান মহালে,—রাজনীতির গুপ্ত মন্ত্রণালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনভ্যাস ও মনের অশান্তিবশত প্রথম কিছুদিন তাঁহার খুবই কষ্টে কাটিল। তিনি কাহারও সহিত মিশিতেন না,—মিশিতে ভালবাসিতেন না,—কাহারও কোন কথায় থাকিতেন না,—কোন বিষয়ে লিপ্তও হইতেন না। কিন্তু দীর্ঘকাল একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাঁহার অভ্যাস হইয়া আসিল,—কষ্টে আর তাঁহার কষ্ট বোধ হইত না,—বরং কিছু সুখবোধ হইতে লাগিল। সুখবোধ হইতে লাগিল এই জন্য যে, মোগলসাম্রাজ্যের রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি, ষড়যন্ত্র কৌশল ক্রমেই তিনি শিখিয়া ফেলিলেন। রাজনীতির মূলমন্ত্র কি এবং তাহার পরিণতি কিসে, তাহাও কিছু কিছু বুঝিলেন। কি করিয়া লোককে বশ করিতে হয়,—কি উপায়ে অন্যের প্রভুত্ব খর্ব্ব করিতে হয়,—কোন্ কৌশলে লোকের

প্রশংসা লাভ করা যায়,—তাহাও একটুএকটু জানিলেন। কোন নূতন বিষয় কিছু জানিলে, বুঝিলে, বা শিখিলে একটু আমোদ হয় বৈ কি? সুতরাং মেহেরের দুঃখ অবসাদময় জীবন,—ক্রমেই শান্তি-সুখ-হিল্লোলে সঞ্জীবিত হইতে লাগিল। কি এক অজ্ঞাত আনন্দময় উচ্চ আশায় তাঁহার প্রাণ সরসতার আধার হইয়া উঠিল। ক্রমে তিনি স্বামিশোক বিস্মৃত হইতে বসিলেন, আপন বর্ত্তমান অবস্থা বিস্মৃত হইতে বসিলেন, এবং আর একজনের ঘোর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার বিষয়,—যাহা জীবনে ভুলিতে পারিবেন না ভাবিয়াছিলেন,—তাহাও বিস্মৃত হইতে বসিলেন।

বিস্মৃত? ঠিক তাহা নহে, তবে সে ভাবটা ঢাকিতে পারিলেন বটে। বিস্মৃতি মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে; কিন্তু স্মৃতি লইয়া তাহাতে মিশিয়া থাকা না থাকা বাসনা-সাপেক্ষ। মেহেরের হৃদয়ের ভালবাসা ও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যে, সের আফগানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। মোগলের সমাজ,—বিধবারও পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। এই জন্যই বিধবা

স্বীয় জীবন নিষ্ফল বোধ করেন না। মেহেরও হৃদয়ের শোক হৃদয়ে চাপিয়া, মোগলের রাজান্তঃপুরের বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনে মনে একটু আশ্বাসিত হইতেও লাগিলেন।

এই সময় তিনি সেই অবরুদ্ধাবস্থাতেই আপন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক পরিচয় দিতে লাগিলেন। সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য, শিল্পকার্য্য এবং বিবিধ কারুকার্য্যে—তিনি শীঘ্রই সর্ব্বত্র সুপরিচিতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত দ্রব্য সকল বাজারে অতি প্রশংসার সহিত বিক্রীত হইতে লাগিল। অন্দরে বাহিরে তাঁহার সুখ্যাতি আর ধরে না। এই সময় তিনি আর একটি এমন জিনিস আবিষ্কার করিলেন,—যাহাতে তাঁহার নাম দেশবিদেশে লোকের জপ-মালা স্বরূপ হইল। সে জিনিসটি,—আতর। সুগন্ধ ও উৎকৃষ্ট গোলাপজলের সারভাগ লইয়া অতি অপূর্ব্ব উপায়ে তিনি এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গন্ধদ্রব্যের আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে বিলাসিনী বেগম ও রাজকুলকন্যাগণের নিকট যেমন তাঁহার আদর ও গৌরব

হইল,—রাজ্যের সম্ভ্রান্ত উজীর-ওমরাহগণের নিকটও সেইরূপ প্রতিপত্তি হইল। শেষ খোদ সম্রাটের কর্ণেও মেহেরের গুণ-গরিমার কথা উঠিল। সম্রাট পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত জানিতেন, এখন আরও কিছু জানিয়া সমধিক সুখী হইলেন। মনে মনে কহিলেন,

"থাক্, আরও কিছুদিন থাক্।—যখন এত দিন ধৈর্য্য ধরিয়া আছি, তখন আরও কিছুদিন অপেক্ষা করি। সুন্দরী যখন পূর্ব্বস্মৃতি সকলই বিস্মৃত হইয়া একমাত্র আমাতেই আত্মসমর্পণ করিবে, তখন আমি তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিব। আর আশঙ্কা কি?—যখন সেই দুর্জ্জয় নের-কেশরী নিহত হইয়াছে, তখন এই মুগ্ধা কুরঙ্গী ত আমারই। সম্পূর্ণরূপে আমাতে অনুরক্ত হইবে বলিয়াই ত তাহাকে অমন দুঃখ-দীর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া—সর্ব্বপ্রকার ভোগ-সুখে বঞ্চিত রাখিয়াছি? দুঃখবোধ না হইলে সুখের মাত্রা উপলব্ধি হইবে না। প্রেম বলপ্রয়োগে হয় না। প্রেমময়ী মেহেরের কৃপা না হইলে আমার সুখ অসম্পূর্ণ হইবে। তাই সে মনোরমাকে এই

বাহ্যিক অনাদর-উপেক্ষার কঠিন আবরণে আবৃত রাখিয়াছি। নহিলে, সে অমূল্য রত্ন—সে স্মৃতি-সুখদায়িনী—চিত্তবিনোদিনী—কি অযত্নের ধন? সে স্থিরযৌবনা, শারদ-কুমুদিনী,—বিদ্যুদ্বরণী—কি ভুলিবার জিনিস? সে হৃদয়ের আলো, স্মরণে সুখ, দর্শনে অতৃপ্তি, শ্রবণে সঙ্গীত,—কি উপেক্ষার বস্তু? সে পিপাসার জল, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে স্বর্গ,—আমার জীবনের সর্ব্বস্ব নিধি,—হায় রে! আমি কি সাধ করিয়া তাহাকে ভুলিয়া আছি? একদিন এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য তাহারই অঙ্গুলি-হেলনে চালিত হইবে!—প্রেমময়ীর ক্রোধ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হউক,—আমার প্রতি তিনি সদয় হউন,—যখন বুঝিব, আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হইয়াছে,—তিনি প্রেম-চক্ষে আমার পানে চাহিয়াছেন, তখন আদরে তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিব, আর পরিপূর্ণ সোহাগে তাঁহাকে বুকে তুলিয়া প্রেম-তৃষ্ণা নিবারণ করিব!—হায়, সে দিন কি আমার হইবে না? এই রত্নসিংহাসনের বামে বসাইয়া একদিন কি আমি সে অতুল রূপ-মাধুরী দেখিতে পাইব না?”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজান্তঃপুরে—বিশেষ এই বেগমমহলে কত-লোক কত উদ্দেশ্যে ঘুরে-ফিরে,—এক দিন এক বৃদ্ধা জ্যোতিষিণী এখানে আসিল। তাহাকে পাইয়া সুন্দরী মহলে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এ হাত দেখায়, ও কপাল দেখায়, সে ভবিষ্যৎ-ফল জানিতে চায়,—এইরূপ যাহার যে মানস, সে তাহাই জানিতে চাহিল। বৃদ্ধা মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে নানারূপ শ্লোক পাড়িয়া, কখন খড়ি কষিয়া, কখন বা মুখে কি মন্ত্র আওড়াইয়া, একে একে উত্তর দিতে লাগিল। সে উত্তরে কেহ সন্তুষ্ট হইল, কেহ হইল না। যাহার পরিণাম শুভ বলিল, সে সন্তুষ্ট হইল,—বৃদ্ধাকে পুরস্কৃত করিল। যাহার মোটের উপর ভাল বলিল না, সে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইল;—পুর-

স্কারও কিছু দিল না। বৃদ্ধা যে প্রশ্ন গণনা করিল, তাহাতে কাহারও বা অতীতের দুই একটা বিষয় ফলিল, কাহারও বা ফলিল না; কাহারও বর্ত্তমানের দুই একটা বিষয় মিলিল, কাহারও বা মিলিল না। সুতরাং একদলের মতে প্রতিপন্ন হইল, "বৃদ্ধা যা গণিয়াছে ঠিক;" একদল বলিল, "ওর কোন জন্মে জ্যোতিষ জানে না,—ও বুড়ী ডাইন্।"

এইরূপ দ্বিবিধ পুরস্কার পাইয়া বৃদ্ধা মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে অন্তঃপুর পার হইতেছে, এমন সময় মেহেরল্‌নেসার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। মেহের তখন নিবিষ্টমনে আপন ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে বসিয়া একটি সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য করিতেছিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিতভাবে দাঁড়াইল। সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া দাঁড়াইল, কি তাঁহার ভাগ্যসম্বন্ধে কিছু অলৌকিকত্ব জানিতে পারিয়া দাঁড়াইল, তা সেই জানে। কিন্তু দাঁড়াইবার ভঙ্গি একটু বিস্ময়সূচক বটে। বিস্মিতা বৃদ্ধা মেহেরকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে কহিল,

"তোমাকে এখানে এমন ভাবে দেখিতেছি কেন মা ? এই দাসী মহলে এমন একটি সামান্য ঘরে তুমি আছ ?"

বৃদ্ধা ভক্তিভরে মেহেরকে অভিবাদন করিল, মেহের প্রতি-অভিবাদন করিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, "হাঁ বাছা, অদৃষ্টক্রমে এখন এই ঘরই আমার আবাস-ঘর হইয়াছে। তা তুমি অমন অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া, ও কি দেখিতেছ ?"

বৃদ্ধা বিস্ফারিত নয়নে মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে পুনরায় বলিল, "মাগো, আমি তোমায় দেখিতেছি।—তুমি ত সামান্যা নও মা ?"

মেহের ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সামান্যা না হইলে কি আর বাঁদী-মহলে এমন ঘরে থাকি ?"

বৃদ্ধা। তা মা, বাঁদী-মহলেই থাক, আর এই এঁদো ঘরেই থাক,—তোমার নসীবে মা অনেক সুখ ঐশ্বর্য্য আছে,—যা তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই !

মেহের। (স্মিতমুখে) আমি কি ভেবেছি না ভেবেছি, তা তুমি বুঝ্বে কি ক'রে ?

বৃদ্ধা একটু ভাবিয়া ও মুখে বিজ্ বিজ্ করিয়া কি মন্ত্র আওড়াইয়া বলিল, "হাঁ, মাঝে মাঝে তুমিও তা ভাবো বটে।—তা মা, তোর ভাবনা ফলিবে। আমি আজ এই বড়-গলা ক'রে ব'লে যাচ্চি, আজ থেকে এক মাসের মধ্যে তুই রাজ-রাণী—হ'বি। স্বয়ং বাদ্সা তোর পেছু-পেছু ফিরবে।—তখন মা, এই বুড়ীকে মনে করিস।"

সহসা মেহের চমকিত হইলেন। তাঁহার বাম অঙ্গ স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি কক্ষে গিয়া একটি মোহর আনিয়া বৃদ্ধার হস্তে দিলেন। একটু হাসিয়া কহিলেন, "এখন এস, যদি খোদা সত্য দিন দেন, ত সেই দিন আসিয়া সাক্ষাৎ করিও।"

বৃদ্ধা। তা আসিব বৈ কি মা,—নিশ্চয় আসিব। আমায় মা, তোমায় পালন করিতে হইবে। এখন আমি চলিলাম।

একটু গিয়া—ফিরিয়া আসিয়া—চারিদিক চাহিয়া—বুড়ী চুপি চুপি বলিল, "মা, এমন খোস-খবরের কথা, এ বেগম-মহলের কাউকে জানাস নে। কি জানি, হিংসেয় কে কি ক'রে বসবে।

আমি মা, অনেক দিনের মজুরী। কেসুমৎ-গোনা আমার পেষা। বেগম-মহলে আজ গুণ্‌তে এসেছিলেম। তা মা, এত মেয়ের হাত দেখ্‌লেম, কপাল পড়্‌লেম, কিন্তু তোর মত জোর-কপাল মা কারো দেখ্‌লেম না। তাই বল্‌ছিলুম, তুই এ এঁদো ঘরেই থাক্, আর বাঁদী-মহলেই থাক্,—তোর নসীব দেখে এই বেগমদেরও চোক টাটাবে।—এরাই তখন তোর বাঁদী হ'বে।"

বৃদ্ধা হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে, মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে চলিয়া গেল।

আশায় আশা বাড়িল। প্রখর অন্তর্দৃষ্টি-শালিনী, চির-বুদ্ধিমতী মেহেরের তখন সেই আত্মজন্মকাহিনী মনে পড়িল। সেই সঙ্গে তাঁহার আজন্মের চির-লুক্কায়িত আশাও হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। এই সময় সেলিমও এক বিশ্বস্ত বাঁদীকে দিয়া মেহেরের মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। বুদ্ধিমতী মেহেরও তাহা বুঝিলেন। কৌশলে তিনিও সেলিমের প্রতি আপনার বর্ত্তমান মনোভাব প্রকাশ করিলেন। ভাবিলেন,

"মানুষ যদি অবস্থা ও ঘটনার যন্ত্র-পুত্তলি

হয়, তবে আমিও তাহা ছাড়া নহি। মুসলমান-সমাজে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা আছে। সেলিম যদি সত্য সত্যই আমাতে অনুরক্ত হন, তবে আমি একটু অনুরাগ দেখাইলেই তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন।—তারপর? তারপর ভারত-সাম্রাজ্য আমার করতলগত হইবে। যে, সাম্রাজ্যের বিনিময়েও আমাকে পাইতে চায়, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা এখন আর আমার কর্ত্তব্য নয়। আমি আজীবন বসিয়া কাঁদিলেও আমার মৃত-স্বামী আর ফিরিয়া আসিবেন না। এমত অবস্থায় সেলিম যদি আমায় ভজনা করেন, তাঁহাকে নিরাশ করা কি আমার উচিত? এখন বুঝিতেছি, আমার ইচ্ছার উপর সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। সেলিমকে উপলক্ষ করিয়া আমি এই ভারত-সাম্রাজ্য চালাইব।

"কিন্তু হায়! যে হস্ত আমার স্বামীর বধরূপ ঘোর অবৈধ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল,—প্রণয়ভরে এখন আমি সেই হস্ত ধারণ করিব?—প্রণয়? ঠিক প্রণয় নহে,—প্রণয়ের অভিনয় মাত্র

করিব। না করিয়াই বা করি কি? পিঞ্জরাবদ্ধা সিংহীর আস্ফালন মাত্র স... না, এ সুযোগ আমি ছাড়িব না। এ ...অন্তঃপুরে থাকিয়া, রাজনীতির মূলমন্ত্র আমি ...রূপ শিখিয়া লইয়াছি;—এখন ক্ষেত্রে দাঁড়া... ইহার ফলাফলটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হানি কি? হাতে পাইয়া জীবনের এ সাধটা অপূর্ণ রাখি কেন? জন্মগ্রহণ যখন করিয়াছি, তখন ত একদিন মরিতেই হইবে! তবে শেষটা দুঃখ পাইয়া মরি কেন? ঐহিক জীবনের যাহা চরম সাধ, সেই সাধটা মিটাইয়াই মরি।

"আমি রাণীগিরি করিব;—একবার ভারত-সিংহাসনে বসিব। আর সেলিম যদি সত্য সত্যই আমায় আদরে গ্রহণ করেন,তবে শেষজীবনে তাঁর আদরিণী গৃহিণীই হইব। প্রতিহিংসা অপেক্ষা প্রেম অনেক বড়। আমি প্রেমে তাঁহাকে বশ করিব। প্রেমে স্বামি-হন্তাকে নির্ম্মল অনুতাপ শিখাইব।—যাহা এ জীবনে গিয়াছে, তাহা ত আর পাইব না? জীবনের বিনিময়েও তাহা পাইব না। তবে যাহা, জীবনের চির আকাঙ্ক্ষ-

নীয়, সাধ করিয়া তাহা পায়ে ঠেলি কেন ? আমি সেলিমের হইব। সেলিম যদি সত্য সত্যই আমায় চান,—কিন্তু তার আগে নিজে একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব।”

আশ্চর্য্যের কারণ নাই। বিধাতার সৃষ্টিরহস্য দুর্জ্জেয়। মনুষ্য-চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা দুর্জ্জেয়। হৃদয়ের অন্তস্থলে কোথায় কখন কি বীজ নিহিত হয়,—তাহা কে বলিতে পারে ? তেমন অলোক-সামান্যা অপূর্ব্বরূপসী মেহেরের তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ হৃদয়ে রাজ-সিংহাসনের লালসা আদৌ স্থান পায় নাই,—এমন কথা বলিতে পারি না। দুর্গম কান্তারে জন্ম, মস্তকে কালসর্পের ‘রাজছত্র’ধারণ, জ্যোতির্ব্বিদের গণনা, অতুল্যরূপ, অসাধারণ প্রতিপত্তি,—এই সকল চিন্তায় মেহেরের হৃদয়ে অতি প্রচ্ছন্নভাবে চিরদিন রাজরাণী হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তবে মেহের অসাধারণ বুদ্ধি-মতী; এজন্য হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া, যখনই যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহাতেই মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।—কিন্তু আজি ত সেই সিংহাসন অনায়াসপ্রাপ্য—মুখের একটু

হাসি, একটু কথায় বোধ হয় সমগ্র ভারত-রাজ্য তাঁহার চরণে লুটাইতে পারে! সুতরাং এ সুযোগ তিনি ছাড়িতে পারিলেন না। তাই, সেলিমের প্রতি প্রেমের টানে নহে,—মোগলের সিংহাসনের আকর্ষণে মেহের স্বামিহন্তার প্রণয়ে বশীভূত হইলেন।

ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা হইয়া গেল। রাজান্তঃপুরে-গমনকারী এক ওমরাহ, মেহেরের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইল। মেহেরের সেই আড়ম্বর-হীন বৈধব্যবেশ, সেই বিষাদে অপূর্ব্ব শোভা-ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া, রূপ-মুগ্ধ সেই ওমরাহ হিতাহিত জ্ঞান হারাইল। প্রথম, ইঙ্গিত-আভাসে—শেষ স্পষ্টভাষে একদিন সে মনের ভাব ব্যক্ত করিল। বলিল, "সুন্দরি! তুমি আমার হও;—নহিলে আমি আত্মঘাতী হইব।" এই বলিয়া সেই রূপোন্মত্ত ওমরাহ মেহেরের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া, বলপূর্ব্বক মেহেরকে বক্ষে ধারণ করিতে উদ্যত হইল। কুপিতা ফণিনীর ন্যায়, মেহের এক শাণিত ছুরিকা,—সেই ওমরাহের হস্তে বসাইয়া দিলেন। কামোন্মত্ত পশু উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়া স্বস্থানে নীত হইল।

সেলিম বুঝিলেন, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। অধিক বিলম্বে নানা বিঘ্ন ঘটিতে পারে। একদিন তিনি সকলের অলক্ষ্যে মেহেরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, সেলিম সকলের অলক্ষ্যে, মেহেরল্‌নেসার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মনে অনেক আশা, অনেক উৎসাহ, অনেক অনুরাগ, অনেক প্রেম লইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন। দেখিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী মেহেরল্‌নেসার অপরূপ রূপে সে ক্ষুদ্র কক্ষ আলোকিত হইয়াছে। মনে হইল, আকাশের চাঁদ আকাশ ছাড়িয়া, এই ক্ষুদ্র কক্ষে উদিত হইয়াছে, আর সেই জীবন্ত চাঁদের সঙ্গিনীগণ নক্ষত্রমালারূপে তাঁহার চতুঃস্পার্শে শোভিত হইতেছে। দেখিলেন, প্রকৃতির চারুচিত্রস্বরূপা স্বভাবসুন্দরী মেহের সূক্ষ্ম শুক্লাম্বর পরিধান

করিয়া, রঞ্জিত চাকচিক্যময় পরিচ্ছদকে লজ্জা দিয়া, নিরাভরণে, এক ক্ষুদ্র পালঙ্কোপরি অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন,—কটির বসন ঈষৎ শ্লথ, বক্ষের বসন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—সূক্ষ্ম বস্ত্রাভ্যন্তর দিয়া দেহের সৌন্দর্য্য-সুষমা ফুটিয়া বাহির হইতেছে,—আর তাঁহার কিঙ্করীগণ পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নবেশে নিম্নে বসিয়া, যথোচিত শিষ্টাচার ও সম্ভ্রমের সহিত,—তাঁহার শিক্ষামত সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। দেখিলেন, সৌন্দর্য্যময়ীর ব্যবস্থাগুণে সেই সামান্য ক্ষুদ্র গৃহ এমন সুসজ্জিত যে, তাঁহার বহু রত্নরাজি-পরিবৃত বৃহৎ প্রাসাদও তেমন পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত নহে। দেখিলেন, দীপাধারে একটি উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে, কিন্তু সেই উজ্জ্বল দীপালোকও যেন জ্যোতির্ম্ময়ী মেহেরের মুখে পড়িয়া মধ্যে মধ্যে ম্লান হইয়া যাইতেছে! দেখিলেন, বহুকাল পূর্ব্বে ঘিয়াস বেগের বাটীতে সেই নিশাভোজ উপলক্ষে, যে কুমারী কিশোরী বিবিধ বেশভুষায় সজ্জিত হইয়া সুমধুর নৃত্যগীতে তাঁহার মন হরণ করিয়াছিল, সেই মনোমোহিনী

কিশোরী আজ যৌবনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল হইয়া, নিরাভরণ বৈধব্যমূর্ত্তিতে অধিকতর দীপ্তি-শালিনী হইয়াছে।—সে ভোগসুখ-রহিতা, অপরূপ বিষাদগাম্ভীর্য্যমিশ্রিতা, মাধুরিমময়ী মোহিনী মূর্ত্তি আজ বুঝি অধিকতর আকর্ষণশালিনী। প্রথম যৌবনের সে স্বভাব-চাঞ্চল্য আজ তিরোহিত; তাহার স্থানে পরিপক্ক যৌবনের সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য,—আজ রূপবতীর প্রতি-অঙ্গে তরঙ্গায়িত। উজ্জ্বল দীপালোক পড়িয়া, সূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্র ফুটিয়া, সে রূপ-তরঙ্গ প্রতিক্ষণে অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া রূপাতুর সেলিম নির্নিমেষ নয়নে এই শোভা দেখিতে-ছিলেন।—দেখিতে দেখিতে দেখিতে, যেন তাঁহার যুগ-যুগান্তরের রূপ-তৃষ্ণা উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার ক্ষুধিত, তৃষিত, অপরিতৃপ্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম,—সম্মুখে চিরবাঞ্ছিত সুখদ ভোগ্য দেখিয়া, যেন পরিপূর্ণ আবেগে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল! তাঁহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িল, চরণ কম্পিত হইতে লাগিল,—তিনি

সম্পূর্ণরূপে অধৈর্য্য ও আত্মহারা হইলেন। কিঙ্করীগণ সম্রাটকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল,—ভয়ে ও বিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ ত্যাগ করিল। মেহের,—পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িতা, আলু-থালু-বেশা মেহের,—উঠিয়া দাঁড়াইতে-না-দাঁড়াইতে, ধৈর্য্য-হারা কম্পিত-কলেবর সেলিম দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

বক্ষে বক্ষ স্পর্শ হইল। মেহের শিহরিলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অতীতের সকল স্মৃতি জাগিল। তিনি নীরবে লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

সেলিম,—ভারত-সম্রাট জাহাঙ্গীর,—লজ্জা-মান-ভয় পরিহার করিয়া, অকপটে, প্রেম-পরিপ্লুত পরিষ্কারকণ্ঠে কহিলেন,

"বল বল, রমণী-কুল-রাজ্ঞী, চিরবাঞ্ছিতে! তুমি আমার হইবে কিনা? ভারতের ভাগ্য-বিধাতাকে পায়ে রাখিবে কিনা?—সাম্রাজ্যের বিনিময়েও আমি তোমায় চাই!—বল বল, জ্যোতির্ম্ময়ি! এ আঁধার হৃদয়ে তোমার স্নিগ্ধ প্রেম-জ্যোতি প্রতিফলিত হইবে কিনা?"

মেহের,—রূপের জীবন্ত প্রতিমা মেহের,—সেলিমের প্রতি একটি মধুর কটাক্ষ করিয়া, হাসি-হাসি মুখে কহিলেন,

"অধীনীর সুপ্রভাত,—তাই ভারতের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা আজ অধীনীকে এ উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিতেছেন!—রাজার সর্ব্ববিষয়েই অবাধ অধিকার,—ইচ্ছাই তাঁহার কার্য্য;—এমত অবস্থায় বন্দিনীর কোন কথা কওয়াই ধৃষ্টতা।"

বচনে বীণাধ্বনি হইল। সুহাসিনীর হাসি-মুখে সুধা ক্ষরিল। রূপময়ীর রূপের তরঙ্গ যেন দেহ উছলিয়া, সেলিমের অন্তস্থল স্পর্শ করিল।

সেলিম—রূপোন্মত্ত সেলিম অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। আবেগভরে কহিলেন,

"তবে, হৃদয়েশ্বরি! আমার এতদিনের আশা পূর্ণ হইল? এত দিনে তুমি আমার হইলে?—অভিমানিনি, তোমায় রাজান্তঃপুরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি বলিয়া তুমি দুঃখিত;—আজ তাহার প্রতিদানস্বরূপ, ভারতের অধীশ্বরকে চিরজন্মের মত তোমার হৃদয়-পিঞ্জরে বন্দী কর!"

সেলিম বামহস্তে মেহেরের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া,

দক্ষিণ হস্তে মেহেরের হাত ধরিলেন। মেহেরও নীরবে হাসি-হাসি মুখে সেই হাতে হাত রাখিয়া দিলেন।

এবার সেলিম যেন স্বর্গ-সুখ অনুভব করিলেন। রূপসীর সে সম্মতিসূচক নীরব হাসি তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিধিল। সে স্পর্শ-সুখ, সে মধুর কটাক্ষ, সে অপরূপ অঙ্গ ভঙ্গি, সে সুস্মিত-বদন,—ভাবিতে ভাবিতে সেলিম সম্পুর্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

মুহূর্ত্তকাল একদৃষ্টে পার্শ্বোপবিষ্টা সেই জীবন্ত প্রতিমা দেখিতে দেখিতে, অন্তরের অন্তরে সেই রূপসুধা পান করিতে করিতে হর্ষোৎফুল্ল সেলিম পুনরায় কহিলেন,

"তবে, প্রাণাধিকে! রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিই,—আগামী শুভদিনে, এমনই ভাবে তুমি এ চিরপ্রণয়প্রার্থী সেলিমের বামে বসিয়া ভারত-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবে?—বল বল, সুহাসিনি! বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য তুমি পায়ে ঠেলিবে না?"

প্রেম-বিহ্বল সেলিম মেহেরের হস্তচুম্বন করি-

লেন। চন্দ্রাননী মেহেরও সে চুম্বনের প্রতিদান করিয়া মধুরস্বরে কহিলেন,

"আমি একবার বলিয়াছি, আবার বলি,—ভারত-সম্রাটের ইচ্ছাই—কার্য্য। রাজ্যেশ্বর প্রভু ভাবিয়া আমি এতদিন যাঁহাকে মনে মনে বন্দনা করিয়া আসিয়াছি,—আজ যদি তিনি নিজগুণে চরণে স্থান দেন, তবে এ অধীনী, তাহা ঈশ্বরের অশেষ করুণা বলিয়া জ্ঞান করিবে।"

অদৃষ্ট দীপ্যমান হইল। সের আফগানের বিধবা পত্নী,—সেই জগদ্বিখ্যাতা আদর্শ-সুন্দরী মেহেরন্নেসার সহিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের পরিণয়-সংবাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। অতঃপর যথাদিনে, মহা সমারোহে এ বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ অন্তে মেহেরের নাম হইল,—"নুরমহল।" কিছুদিন পরে সে নাম ঘুচিয়া আরও সম্মানিত নামে তিনি অভিহিত হইলেন। এবার তাঁহার নাম হইল,—"নুরজাহান্" বা আদর্শসুন্দরী "জ্যোতির্ম্ময়ী।"

প্রখরবুদ্ধিশালিনী, সুচতুরা নুরজাহান আপন

বুদ্ধিবলে ও অলৌকিক রূপশ্রীপ্রভাবে,—অতি অল্পদিন মধ্যে সেলিমকে মুগ্ধ করিলেন। অতি অল্পদিন মধ্যে রূপমুগ্ধ সেলিমের হৃদয়ের উপর তাঁহার প্রবল আধিপত্য স্থাপিত হইল। সেলিম নাম মাত্র রাজা রহিলেন,—রূপসী নুরজাহান্‌ই ভারত-রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী হইলেন।

রাজকার্য্য, রাজকীয় বিচার, রাজনৈতিক মন্ত্রণা,—এ সমস্ত বিষয়েই নুরজাহানের প্রাধান্য দিনে দিনে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। একাধারে নারী-জনোচিত কমনীয়তা এবং পুরুষোচিত কাঠিন্য,—তাঁহাতে প্রকাশ পাইল। আবশ্যক-বোধে এই সময় হইতে তিনি শিকার, মল্লক্রীড়া এবং যুদ্ধাদি বীরোচিত কার্য্যও শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং যথাস্থানে তাহার প্রক্রিয়াও দেখাইলেন। লোকে তাঁহার বুদ্ধিচাতুর্য্য, কার্য্য-করিশক্তি, সূক্ষ্মবিচার-প্রণালী, রাজ্যশাসনক্ষমতা এবং সর্ব্ববিষয়েই অসাধারণ সাহস ও নির্ভীকতা দেখিয়া অবাক্ হইল।

কন্যার ভারত-রাজ্যেশ্বরী পদপ্রাপ্তির সহিত ঘিয়াস্‌ বেগের অবস্থারও সমধিক উন্নতি হইল।

তিনি সম্রাটের সর্ব্ব প্রধান অমাত্যরূপে মনোনীত হইলেন।

ঘিয়াস বেগের বিস্ময় সীমা ছাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি সদাই ভাবিতেন, "হায়, এমন দিনে কোথায় আমার সেই জীবনসঙ্গিনী আমিনা? অভাগিনী মনের দুঃখে বিজন মরুভূমে প্রাণ ডালি দিল,—দেখিতে পাইল না, আজ তাহার প্রাণাধিকা দুহিতা,—সত্য সত্যই রাজ-রাজেশ্বরী হইয়া বিশাল ভারতরাজ্য শাসন করিতেছে!—হায়, সত্য! বুঝিলাম, স্বপ্ন অপেক্ষাও তুমি প্রহেলিকাময়!"

কিছুদিনের মধ্যে নুরজাহান্, প্রচলিত ভারতীয় মুদ্রা আপন নামে চালাইলেন। তাঁহার উচ্চাভিলাষ ষোলকলায় পূর্ণ হইল।

রূপের জয় হইল।